আশরাফুল জওয়াব

প্রথম খণ্ড

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবূ আশরাফ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের আরয

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين -

সৃষ্টিকুলের পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা। সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ইসলাম জীবন-সমস্যার চিরন্তন সমাধান। কিন্তু সূচনালগ্ন থেকেই নব উদ্ভাবিত স্পষ্ট কিংবা প্রচ্ছন্ন শিরক-বিদআত, অনৈসলামী রেওয়াজ-প্রথা, যুগ-চাহিদা-প্রসূত সংশয়-সন্দেহ ইত্যাদির অবাঞ্ছিত প্রবাহ ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধে আঘাত হানার উলঙ্গ প্রয়াস চালিয়ে আসছে। প্রতিটি যুগে ইসলামী চিন্তানায়ক ও হক্কানী আলিমগণের তীব্র প্রতিরোধের মুখে সেসব আঘাত নস্যাৎ হয়ে যায়।

উপমহাদেশের অবিসংবাদিত অগ্রনায়ক মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) রচিত "আশরাফুল জওয়াব" শীর্ষক গ্রন্থটি সে জাতীয় প্রতিরোধেরই বাস্তব প্রয়াস। এগুলো মূলত তাঁর বিভিন্ন সময়ের ওয়ায এবং তাঁর প্রতি পাঠানো প্রশ্নাবলীর জবাবের সমষ্টিবিশেষ, যা পরে "আশরাফুল জওয়াব" শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি অনৈসলামী রেওয়াজ-রীতি ও সংশয়-সন্দেহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করত ইসলামসম্মত বাস্তবধর্মী সমাধান নির্দেশ করেছেন যা আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার চাহিদা পূরণে পুরোপুরি সক্ষম।

গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। তন্মধ্যে যুক্তির বলিষ্ঠ প্রয়োগ, বিষয়বস্তুর সাবলীল পর্যালোচনা এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক উপস্থাপনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সামাজিক পরিবেশ ও আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে একে তাদের বৃহত্তর অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসে এবং আমার ওপর সে দায়িত্ব অর্পণ করে। হাকীমুল উম্মতের উর্দু বইয়ের ভাষান্তর কর্ম আমার মতো অযোগ্যের জন্য দুঃসাহসিক চিন্তা। তবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-ছোঁয়ায় ক্ষুদ্র কীটের পক্ষেও বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেয়া কঠিন কিছুই না। তাই একমাত্র আল্লাহ্‌র রহমতের ভরসা করেই আমি এ কাজে অগ্রসর হই।

বলা বাহুল্য, অনুবাদকর্মে আমি হযরত হাকীমুল উম্মতের বিষয়-বক্তব্য তাঁরই ভঙ্গিতে পেশ করার চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস—তাঁর বলার ভঙ্গিই অন্তরকে প্রবল ঝাঁকুনি দেয় এবং তাঁর প্রভাব বলয়ে মানুষের হৃদয়-মন দারুণ আকর্ষণ করে। আলোচ্য গ্রন্থটির কোন কোন প্রসঙ্গ আমাদের বাংলাদেশী সমাজ-পরিবেশে পুরোপুরি মিল না-ও খেতে পারে। আমি বাদ দেইনি দুই কারণে ঃ (ক) মূল গ্রন্থকারের

বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করাই অনুবাদকের দায়িত্ব, (খ) বিষয়টি এমন মৌলিক নয় যে, এড়িয়ে যেতেই হবে। এখন মানগত দিক থেকে এ অনুবাদকর্ম কোন্ পর্যায়ের, ভাষার দ্যোতনা ক্লান্তিকর কি-না সে কথা পাঠকদের বিবেচ্য। তবে আল্লাহ্‌র ফযলে আমি পূর্ণ আস্থাশীল যে, গ্রন্থের মূল আবেদনের সাথে অনুবাদের নিবিড় সম্পর্কের কোথাও বিচ্যুতি ঘটেনি।

এ অনুবাদকর্মে আমার প্রেরণার উৎস সাহিত্য জগতের অন্যতম দিশারী, মাসিক মদীনা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের শুকরিয়া আদায় না করা অকৃতজ্ঞতার শামিল হবে। এ ছাড়া সাইয়্যেদ জহীরুল হক জহীরসহ আরো অনেকের কাছ থেকে আমি উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে লক্ষ-কোটি বাংলাভাষী মুসলমানের মনের চাহিদা পূরণ এবং সন্দেহ ও যুগ-জিজ্ঞাসার ঘূর্ণিপাকে বিভ্রান্ত মানুষকে আলোর সন্ধান দিয়েছে।

পরিশেষে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ে দিকভ্রান্ত মানবতাকে আলোর ভুবনে পথ দেখাক, এর দুর্বার গতি প্রবাহে মুসলমানের নির্জীব অন্তর জাগ্রত হয়ে উঠুক—রাব্বুল আলামীনের দরবারে এটাই আমার সবিনয় মুনাজাত। রাব্বুল আলামীন! একে তুমি সার্থক করে তোলো, আমাদের সবার পক্ষ থেকে একে নাজাতের উসীলা হিসাবে কবূল করে নাও। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

কামরাঙ্গির চর (মুমিন বাগ), ঢাকা
রমযানুল মুবারক
১৪০৭ হিঃ

বিনীত
মুহাম্মাদ আবূ আশরাফ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)

১৭০৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবনাবসানের পরপরই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিশেষত ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলিম সমাজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এহেন পতন যুগের গোড়ার দিকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উত্তরসুরি শাহ্ আবদুর রহীম, শাহ্ আবদুল আযীয, শাহ্ ইসমাঈল শহীদ, সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী প্রমুখ বরেণ্য আলিম জাতিকে পতনের হাত থেকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অবশ্য বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা ও প্রতিকূলতার প্রেক্ষাপটে তাঁদের সে চেষ্টা আপাত ব্যর্থ হয়ে যায়। জাতীয় দুর্যোগের পরবর্তী পর্যায়ে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে সকল মুসলিম মনীষী হিমালয়ান উপমহাদেশে জন্মগ্রহণ করেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) তাঁদের অন্যতম।

জন্মস্থান ঃ উত্তর ভারতের মুজাফফরনগর জেলার অন্তর্গত 'থানাভূন' একটি ঐতিহ্যবাহী বর্ধিষ্ণু জনপদ। 'আইনে আকবরী'র বর্ণনা সূত্রে স্থানটি সংযুক্ত আগ্রা ও আওধের প্রসিদ্ধ অঞ্চল, যার কোলে ইতিহাস সৃষ্টিকারী বহু মুসলিম মনীষা জন্মগ্রহণ করেন। এক কথায় 'থানাভূন' অঞ্চলটিকে বীর-প্রসূ এলাকা আখ্যায়িত করা আদৌ বাড়িয়ে বলা নয়। থানাভূন আদিতে রাজা ভীমের নামানুসারে 'থানাভীম' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বহুল প্রচলনে 'থানাভূনে' রূপান্তরিত হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত মুসলিম অভিজাত পরিবারগুলির বসতি স্থাপনের পর এক পর্যায়ে অঞ্চলটি জনৈক "ফতেহ মুহাম্মদের" নামানুসারে "মুহাম্মদপুর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শাহী দলীলপত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে থানাভূন নামে এর পূর্ব পরিচিতি যথারীতি বহাল থাকে। পক্ষান্তরে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ইম্পেরিয়াল গেজেটের বর্ণনামতে, কোনও এক সময় এখানে সুপ্রসিদ্ধ ভবানী মন্দির অবস্থিত ছিল। সুতরাং উক্ত মন্দিরের সাথে সম্পৃক্ত করে পার্শ্ববর্তী জনপদ "থানাভূন" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আযাদী আন্দোলনের পূর্বে এখানকার জনসংখ্যা ছিল ৪৮ হাজার। বিপ্লবোত্তরকালে প্রথমত ৩৬ হাজার, এমন কি এক পর্যায়ে তা হ্রাস পেয়ে মাত্র ৬/৭ হাজারে নেমে আসে। ঐতিহ্যবাহী থানাভূনের পার্শ্ববর্তী গাংগুহ, দেওবন্দ, কীরানা, ঝনঝানা, কান্দলা, পানিপত ইত্যাদি অঞ্চলের ঐতিহাসিক খ্যাতি রয়েছে।

মাওলানা থানভীর জন্মলগ্নে তাঁর পিতৃ-মাতৃ উভয়কুল থানাভূনের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ ঝনঝানা থেকে আর সম্রাট আকবরের শাসনামলে তাঁর পিতৃকুলের জনৈক মাওলানা সদর জাহান থানেশ্বর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে থানাভূনে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন।

জন্ম ঃ মাওলানা থানভী (র) হিজরী ১২৮০ সনের ৫ই রবিউস্‌সানী বুধবার সুবহে সাদিকের সময় থানাভূনের 'খীল' মহল্লাস্থ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশধারা হযরত উমর ফারুক (রা) আর মাতার দিক থেকে হযরত আলী (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে হযরত উমর ও আলী (রা)—মহান দুই সাহাবীর রক্তধারা প্রবাহিত। অতএব, তাঁর সত্তা ফারুকী ও উলুভী রক্তপ্রবাহের মিলনকেন্দ্র বলা যায়।

তাঁর জন্ম ও নামকরণ সম্পর্কে বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত রয়েছে ঃ একবার তাঁর পিতা মুনশী আবদুল হক কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হন। সকল চিকিৎসা বিফল হওয়ার পর জনৈক ডাক্তার বললেন ঃ এর একটি মাত্র ঔষধ রয়েছে, যা সেবনে প্রজনন ক্ষমতা রহিত হওয়া অনিবার্য। রোগ যন্ত্রণায় অস্থির নিরুপায় পিতা প্রাণের মায়ায় অগত্যা তাই গ্রহণ করেন। তাঁর মা ও নানী ঘটনা অবগত হয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা তখনো পর্যন্ত তাদের কোনও পুত্র সন্তান বেঁচে ছিল না।

এরি মধ্যে ঘটনাক্রমে হাফেয গোলাম মুরতাযা পানিপতি (র) নামক জনৈক মজযূব ওলীআল্লাহ মাওলানা থানভীর নানাবাড়ি বেড়াতে আসেন। এক ফাঁকে নানী হাফেয সাহেবের নিকট ঘটনা জানিয়ে আবেদন করেন যে, আমার এ কন্যাটির কোন পুত্র সন্তান বেঁচে থাকে না। এর কোনও তদবীর নির্দেশ করুন। ঘটনা শুনে হাফেয সাহেব বললেন ঃ "উমর ও আলীর টানাহেঁচড়ায় সন্তানরা মারা যায়। আচ্ছা, এবার আলীর হাতে সোপর্দ করে দিও, বেঁচে থাকবে।" তাঁর এ ইঙ্গিতপূর্ণ অস্পষ্ট কথার মর্ম বোঝা উপস্থিত কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। দূরদর্শী থানভী-জননী এর মর্ম উদ্ধারে সক্ষম হন। তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন—হাফেয সাহেবের ইঙ্গিত-বাণীর মর্ম হলো—পুত্রদের পিতা ফারুকী আর মাতা উলুভী। এ যাবত এ বংশে যত ছেলের জন্ম হয়েছে 'ফযলে হক' ইত্যাদি পিতৃকুলের সাথে মিলিয়ে তাদের নাম রাখা হয়েছে। এখন থেকে যত ছেলে হবে শেষাংশ 'আলী' যোগে মাতৃবংশের সাথে মিলিয়ে নাম রাখবে। ব্যাখ্যা শুনে হাফেয সাহেব হেসে দিয়ে বললেন ঃ "ঠিকই বলেছ, আমার উদ্দেশ্য তাই ছিল। বাস্তবিক মেয়েটি বড় বুদ্ধিমতী মনে হয়।" অতঃপর হযরত থানভীর বিদুষী মায়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বললেন ঃ "এর দুটি ছেলে হবে এবং জীবিত থাকবে। একটির নাম আশরাফ আলী খাঁ, দ্বিতীয়টির নাম আকবর আলী খাঁ রাখবে।" নাম নেয়ার কালে মনের ঝোঁকে নিজের পক্ষ থেকে তিনি শেষাংশে 'খাঁ'

পদবী বাড়িয়ে দেন। উপস্থিত একজন জিজ্ঞেস করল ঃ হযরত ! তারা কি পাঠান হবে ? তিনি বললেন ঃ না, আশ্‌রাফ আলী ও আকবর আলী নাম রাখবে। তিনি আরো বললেন—উভয়ই হবে ভাগ্যবান। তাদের একজন হবে আমার এবং সে হাফেয-আলেম হবে। অপরজন হবে দুনিয়াদার। উত্তরকালে হাফেয গোলাম মুরতাযা মজযূবের সে ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথ বাস্তবে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, পিতৃকুলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল আবদুল গনী। এ নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।

বাল্য জীবন ঃ উক্ত বুযুর্গের ফয়েয ও বরকতে উল্লিখিত তারিখে মাওলানা থানভীর জন্মের প্রায় চৌদ্দ মাস পর তাঁর ছোট ভাই আকবর আলী জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় মায়ের দুধে দুই ভাইয়ের সংকুলান না হওয়ায় শিশুপুত্র আশরাফ আলীর জন্য জনৈকা মিরাঠি ধাত্রী নিয়োগ করা হয়। প্রায় পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মায়ের ইন্তিকালের পর তিনি প্রধানত পিতৃস্নেহে লালিত হন। বাল্যকাল থেকেই মাওলানা থানভী লেখাপড়ায় যেমন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী তদ্রূপ আচার-আচরণেও ছিলেন অনন্য শিষ্টাচারে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাল্য বয়সেই লেখাপড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও নামাযের প্রতি তিনি অস্বাভাবিক আসক্ত ছিলেন। এমনকি খেলার মধ্যেও সমবয়সীদের সারিবদ্ধ করে তিনি নামায নামায খেলায় মেতে উঠতেন। মাত্র ১২/১৩ বছর বয়সেই তিনি তীব্র শীতের মধ্যেও তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ মিরাঠের দীনদার আলেম জনৈক আখুনজীর হাতে তাঁর হিফযে কুরআনের সূচনা হয়। তাঁর নিকট কয়েক পারা হিফয করার পর দিল্লীর প্রসিদ্ধ হাফেয হুসাইন আলী সাহেবের নিকট তিনি অবশিষ্ট হিফয সমাপ্ত করেন।

অতঃপর ফারসীর প্রাথমিক কিতাব মিরাঠের কয়েকজন ওস্তাদের নিকট, মাধ্যমিক কিতাব মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মদ সাহেবের নিকট আর শেষ পর্যায়ের কিতাব আপন মামা ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ উপস্থিত হন। বিশ্ববিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসায় তিনি মাত্র পাঁচ বছরে (হিঃ ১২৯৫-১৩০১) শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে এখানকার উচ্চতর সনদ হাসিল করেন।

স্বল্পতম শিক্ষা জীবনে তিনি আরবী, ফারসী, হাদীস, তাফসীর, ফাসাহাত, বালাগাত, ফিকাহ, মানতিক, ইলমে কালাম, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা তদুপরি উলূমে যাহিরীর সাথে সাথে উলূমে বাতিনী তথা অধ্যাত্ম জ্ঞানেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

কর্মজীবন ঃ শিক্ষা জীবন সমাপনের পর পরই মাওলানা থানভী (র) কানপুরের প্রাচীনতম দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ফয়যে আম' মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘ

চৌদ্দ বছর সার্থক শিক্ষাদানের পর বিশেষ কারণে তিনি শিক্ষকতা থেকে ইস্তফা দেন এবং জন্মভূমি থানাভূন ফিরে যান।

বায়‘আত গ্রহণ ঃ হযরত মাওলানা থানভীর ছাত্র জীবনে তাঁর তরীকতের মুরশিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (র) মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন। মাওলানা থানভীর ছাত্রজীবনের শেষপাদে হিঃ ১২৯৯ সনে হাজী ইমদাদুল্লাহ্‌র হাতে গায়েবানা বায়‘আত গ্রহণ করেন। অতঃপর হিঃ ১৩০১ সনে পিতাসহ মাওলানা থানভী হজ্জে গমন করেন এবং তথায় পিতা-পুত্র উভয়ে হাজী সাহেবের হাতে সাক্ষাৎ বায়‘আত হন। এর দশ বছর পর পুনরায় তিনি হজ্জে রওয়ানা হন এবং হজ্জের পর ছয় মাস স্বীয় মুরশিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে কাটিয়ে তরীকতের পথে উচ্চতর মাকাম অতিক্রম করেন। দ্বিতীয়বার হজ্জ সমাপনের পরই তাঁর চিন্তাধারা নতুন খাতে মোড় নেয়। এখন থেকে তিনি তরীকতের ভাবধারায় মানব চরিত্র সংশোধনের কথা চিন্তা করতে থাকেন। সুতরাং হজ্জ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এক সময় শিক্ষকতায় ইস্তফা দেন এবং শায়খের নির্দেশে থানাভূনের রূহানী খানকায় ফিরে অধ্যাত্ম জীবন শুরু করেন । আমরণ এখানেই তিনি লাখো-হাজার বিভ্রান্ত মানুষকে অধ্যাত্ম পথের শিক্ষা ও দীক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন। হিজরী ১৩১৫ সনে তাঁর খানকাই জীবন তথা তরীকতের পথে নব যাত্রা শুরু হয়।

ওফাত ঃ হিজরী ১৩৬২ সনের ১৬ রজব রোজ মঙ্গলবার (মুতাবিক ২০শে জুলাই ১৯৪২ খৃঃ) হিমালয়ান উপমহাদেশের কৃতী সন্তান, চতুর্দশ শতাব্দীর বিভ্রান্ত মানবতার নব দিগন্তের দিশারী, মুজাদ্দিদে জামান, যুগ-স্রষ্টা, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন।

থানভী-রচনাবলী ঃ হযরত মাওলানা থানভীর কর্মময় জীবনকে মোটামুটি দুই-ভাগে বিন্যাস দেয়া যায়। (ক) চরিত্র গঠন, (খ) রচনাবলী।

চরিত্র গঠন পর্যায়ে তাঁর শ্রম-সাধনা সার্থক বলা যায়। কেননা মাওলানা থানভী (র) এত অধিক পরিমাণে চরিত্র গঠন করেছেন যা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে বিরল। তাঁর তৈরী অসংখ্য দেশবরেণ্য আলিম বিশ্বজোড়া খ্যাতির শীর্ষে বিরাজমান। যাদের মধ্যে মাওলানা যুফর আহমদ উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ শফী, হাকীমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব, মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা আতহার আলী সিলেটি, মাওলানা আবদুল ওহাব পিরজী, মাওলানা নূর বক্স সাহেব নোয়াখালী প্রমুখসহ আরো শত-সহস্র জাতীয় ও শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে দীনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে হিদায়েতের আলো বিকিরণ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক

তথা বাস্তবের প্রতিটি অঙ্গন মাওলানা থানভীর গড়া মনীষীবৃন্দের অবদানে ধন্য, আগামী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত যাঁদের কৃতিত্বের সফল ও গতিশীল প্রবাহ তীব্র ধারায় অব্যাহত থাকবে বলাটা অতিশয়োক্তি নয়।

দ্বিতীয়ত, চতুর্দশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী শতাব্দীসমূহের উম্মতে মুসলিমা তথা বিশ্ব মানবতার প্রতি হাকীমুল উম্মতের অপর অবদান তাঁর অসংখ্য মাওয়ায়েয ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী। কর্মময় জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি ব্যয় করেছেন এর পিছনে। জীবনের প্রতিটি দিক, প্রতিটি অঙ্গন তাঁর রচনা-স্বাক্ষরে ধন্য বলা যায়। সুতরাং হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, ফতোয়া, কালামশাস্ত্র, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র, মানতিক, ফালসাফা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ বর্তমান রয়েছে। তন্মধ্যে তাফসীর বয়ানুল কুরআন, তাবলীগ দীন, তালীমুদ্দীন, নশরুত্তিব, হায়াতুল মুসলিমীন, ফতোয়া ইমদাদিয়া, বেহেশ্‌তী জেওর, খুতবাতুল আহকাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত বয়ানুল কুরআন তাফসীর হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত। খুতবাতুল আহকাম আজকের উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি মসজিদে পঠিত খুতবা আর বেহেশতী জেওরকে উপমহাদেশের শত্রু-মিত্র, পক্ষ-বিপক্ষ সকল পরিবারের পারিবারিক গ্রন্থ বলা যায়। কর্মময় জীবনের স্থায়ী কৃতিত্বের স্বাক্ষরস্বরূপ তাঁর রচিত, সংকলিত ও অনূদিত সহস্রাধিক গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র এগার খণ্ডে সমাপ্ত বেহেশতী জেওর গ্রন্থটি উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অন্দর মহলে তাঁর আবেদন-অবদান পৌছে দিয়ে তাঁকে আপনজন ও গণমাওলানায় পরিণত করেছে। অধিকন্তু আলোচ্য গ্রন্থটিকে মুসলিম নারী জাতির প্রতি তাঁর একক ও অনন্য অবদান বলা যায়। মোট কথা, হযরত মাওলানা থানভীর লিখিত এ-বিপুলসংখ্যক কিতাব, গ্রন্থ ও মাওয়ায়েয মুসলিম মিল্লাতের প্রতি তাঁর চির অবদান একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রথম ভাগ

ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের
বিজ্ঞানসম্মত সমাধান

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ১৫-৭২

দ্বিতীয় ভাগ

রাফেযীদের বিভিন্ন সংশয়, সন্দেহ ও অভিযোগের ইসলামসম্মত সমাধান ৭৩-৮৫

বিদ'আতপন্থীদের জবাব ৮৫-১৬০

গায়রে মুকাল্লিদীনদের প্রশ্নের উত্তর ১৬১-১৮৩

সাধারণ লোকের সন্দেহের অবসান ১৮৩-২২০

বহুল প্রচলিত ভুল সংশোধন ২২০-৩১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রশ্ন ঃ ১. ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে ?

উত্তর ঃ (ক) তরবারির জোরেই যদি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করত, তবে তাদের অন্তরে তরবারির স্থায়ী প্রভাব কিভাবে রেখাপাত করতে পারে ? অন্তরে এ জাতীয় প্রভাবের প্রমাণ হলো তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্ণ নির্মল ও ইসলামী শরীয়তের শিক্ষার আলোকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে উঠেছিল। হযরত আলী (রা)-এর বর্ম চুরি হয়ে গেলে জনৈক ইহুদীর নিকট তা পাওয়া যায়। তিনি বললেন ঃ এটা আমার বর্ম। ইহুদী বললো, তা-হলে সাক্ষী উপস্থিত করুন। আল্লাহু আকবার! নিজেকে তিনি ইসলামী শিক্ষার কি রকম এক দীপ্ত প্রতীক এবং বাস্তব নমুনারূপে গড়ে তুলেছিলেন যে, জনগণকে বাক-স্বাধীনতা তো দিয়েছেনই, তদুপরি নিজের কর্মের দ্বারাও অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। একজন ইহুদী পর্যন্ত মুসলিম জাহানের খলীফাকে "সাক্ষী উপস্থিত করুন" বলার সাহস করতে পারে। অথচ ইহুদীরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত জাতি। হযরত মূসা (আ)-এর সাথে অবাধ্য আচরণ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত তারা লাঞ্ছিত হয়েই জীবন কাটাচ্ছে এবং এখনো যেখানে যেখানে আছে অপমানের শিকার হয়েই বেঁচে আছে! কবি যথার্থই বলেছেন ঃ

عزیزے کہ از در گہش سر بتافت
بهر در کہ شد ہیچ عزت نیافت

—মহান আল্লাহর দরবার থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে, যে কোন দরবারেই সে হাযির হোক কোন সম্মানই তার ভাগ্যে জুটবে না।

সুতরাং একে তো জাতিগতভাবে তারা লাঞ্ছিত জাতিরূপে চিহ্নিত, দ্বিতীয়ত তাঁর শাসনাধীনেই সে ইহুদী লোকটি বসবাস করছে। এহেন অবস্থায় তার এ দুঃসাহস! বন্ধুগণ, এটাই ছিল সত্যিকারের আজাদী। পক্ষান্তরে ইদানীং আজাদীর যে রূপরেখা বর্ণনা করা হচ্ছে মূলত তা স্বাধীনতাই নয় ; কেননা আজাদীর নামে মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে বর্জন করে দীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ প্রকৃত আজাদী হলো কোন হকদারের মুখ বন্ধ না করা, কারো প্রতি জুলুম না করা। মহানবী

(সা)-এর অবস্থা ছিল এই যে, তাঁর কাছে জনৈক ইহুদীর কিছু পাওনা ছিল। একদিন মসজিদে হাযির হয়ে সে হুযূর (সা)-কে লক্ষ করে কিছু বেপরোয়া মন্তব্য করে বসলো। উপস্থিত সাহাবীগণ তাকে ধমক দিয়ে উঠলেন। নবী করীম (সা) বললেন ঃ ان لصاحب الحق مقالا (অর্থাৎ পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে।)

সুতরাং সত্যিকারের স্বাধীনতা হলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় জনগণকে পূর্ণ বাক-স্বাধীনতা দান করা। অতএব হযরত আলী (রা) বাস্তব কর্মের মাধ্যমে এমন স্বাধীনতা দান করেছিলেন যে, একজন ইহুদীও বলতে পেরেছিল ঃ "সাক্ষী উপস্থিত করুন অথবা মোকদ্দমা দায়ের করুন।" সুতরাং হযরত আলী (রা) হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল থেকে বিচারকের পদে আসীন হযরত শুরাইহ্ (রা)-এর আদালতে মামলা দায়ের করলেন। বাদী ও বিবাদী হযরত আলী (রা) ও উল্লেখিত ইহুদী আদালতে হাযির হলেন। হযরত শুরাইহ্ (রা) শরীয়তের নীতি অনুসারে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। আমীরুল মু'মিনীনের আগমনের ফলে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন না। বরং প্রশান্তচিত্তে ইহুদীকে প্রশ্ন করলেন ঃ বিতর্কিত বর্মটি কি হযরত আলী (রা)-এর। সে অস্বীকার করল। অতঃপর হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ সাক্ষী পেশ করুন। আল্লাহু আকবার! লক্ষ করুন স্বাধীনতা কাকে বলে, অধীনস্থ একজন বিচারক স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীনের নিকট সাক্ষী তলব করছেন। অথচ আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এটা কল্পনাই করা যায় না যে, তিনি কোন অন্যায় বা অবান্তর দাবি পেশ করবেন। কিন্তু এখানে ছিল নীতির প্রশ্ন। আল্লাহ্র কসম! সভ্যতা যারা শিখেছে ইসলাম থেকেই শিখেছে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইসলামের অনুরূপ আমল করতে সক্ষম হয়নি। যা হোক, হযরত আলী (রা) দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করলেন। একজন হযরত হাসান (রা) অপরজন 'কামবার' নামীয় তাঁর আযাদকৃত গোলাম। হযরত শুরাইহ্ (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে এ ব্যাপারে দ্বিমত ছিল যে, হযরত শুরাইহ্ (রা)-এর নিকট পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা) এটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। কাজেই তিনি হযরত হাসান (রা)-কে সাক্ষীরূপে পেশ করেছিলেন। দ্বিমত দেখা দিলে আজকাল আলিমগণকে গালমন্দ করা হয়, তাঁদের বিরূপ সমালোচনা করা হয়। অথচ পূর্ব থেকেই এ জাতীয় মতভেদ চলে আসছে। কিন্তু তখন বর্তমান যুগের মত আলিমগণের নামে কুৎসা ও নিন্দাবাদ রটনা করা হতো না। একে অপরকে কাফির ও গুমরাহ বলতেন না। ইদানীংকালের গালি-গালাজের পেছনে নিজেদের হীন স্বার্থ ছাড়াও এর এক বিশেষ কারণ এই যে, সর্বত্র নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি

বিদ্যমান। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ পরস্পর মিলিত হয়ে প্রকৃত ঘটনা ও সমস্যার মূল রহস্য উদ্ঘাটনের কোন চেষ্টাই করেন না। অধীনস্থ লোকেরা ঘটনার যে বিবরণ দেয় তাকেই যথার্থ বলে মেনে নেয়া হয়। কিন্তু এ ধরনের বর্ণনাকারীকে সতর্ক করা হয় না।

মোট কথা, হযরত আলী (রা)-এর মতে (পিতার পক্ষে) পুত্রের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু হযরত শুরাইহ্ (রা) এ মত স্বীকার করতেন না। সুতরাং হযরত শুরাইহ্ (রা) স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা)-এর সাক্ষী বাতিল করে দিলেন এবং হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ গোলাম যেহেতু আযাদকৃত কাজেই তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু হযরত হাসান (রা)-এর স্থলে অন্য কোন সাক্ষী পেশ করুন। আলী (রা) বললেন ঃ অপর কোন সাক্ষী নেই। অতঃপর বিচারপতি হযরত শুরাইহ্ (রা) হযরত আলী (রা)-এর মামলা খারিজ করে দিলেন। লক্ষণীয় যে, বর্তমান কালের কোন শাসনকর্তা হলে শুরাইহ্ (রা)-এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিচারপতি হযরত শুরাইহ্ ও হযরত আলী (রা) তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ী ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন দীনের প্রতিটি হুকুমের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। শুরাইহ্ (রা)-কে যদি জিজ্ঞেস করা হতো, তবে তিনি কসম খেয়ে হয়তো বলতেন যে, হযরত আলী (রা) সত্যবাদী। কিন্তু ইসলামী আইন ও শরীয়তের নীতিমালা যেহেতু এর অনুমতি দেয় না, কাজেই তিনি হযরত আলী (রা)-এর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভিত্তিতেই রায় দেননি। শেষ পর্যন্ত (শুরাইহ্-এর এজলাসের) বাইরে এসে প্রতিপক্ষ ইহুদী লোকটি লক্ষ করল, হযরত আলী (রা) (শারীরিক শক্তিতে) আসাদুল্লাহ্ (আল্লাহ্র বাঘ) এবং (রাজ শক্তিতে) স্বয়ং শাসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চেহারায় আদৌ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নি। কোন বিষয় তাঁকে ক্রোধান্বিত করেনি। মনে মনে চিন্তা করে সে বলল— "আসল রহস্য আমার এখন বুঝে এসেছে—তাঁর ধর্মই সঠিক ও সত্য। এটা তারই প্রভাব। তাই সে বলল—ধরুন, এটা আপনারই বর্ম আর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি ঘোষণা করছি ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

তিনি বললেন ঃ এটি আমি তোমাকেই দিয়ে দিয়েছি। মোটকথা, সে ইহুদী মুসলমান হয়ে তাঁর সাহচর্যেই কাল কাটাতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত কোনও এক যুদ্ধে শাহাদতবরণ করল। এখন বলুন! সেকি মাথার উপর হযরত আলী

(রা)-এর তলোয়ার দেখে মুসলমান হয়েছিল, না তা কোষবদ্ধ দেখে?
—ইযালাতুল গাফলত, পৃ. ৪

উত্তর ঃ (খ) ইউরোপীয়দের ধারণা—ইসলাম প্রচারে তলোয়ারের উপরই অধিক নির্ভর করা হয়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে তারা মুসলিম সম্রাটদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহকে পেশ করার প্রয়াস চালিয়ে থাকে। আমি তাদেরকে বলতে চাই, "যুদ্ধ-বিগ্রহ সামগ্রিকভাবে সভ্যতা বিরোধী" কোন বিবেকবান ব্যক্তি একথা বলতে পারে না। বর্তমানকালের সভ্য জাতিসমূহও প্রয়োজনে যুদ্ধের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ করা সভ্যতার নিরিখে বৈধ। এসব কথা বলে অত্যাচারী শাসকদের পক্ষপাতিত্ব করা আমার উদ্দেশ্য নয় বরং খুলাফায়ে রাশিদীনের ব্যাপারে আমি পূর্ণ আস্থাসহ দাবি করে বলতে চাই যে, তাঁরা অযৌক্তিকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন নি, বরং কোনও সংগত কারণ এবং প্রয়োজনেই কেবল যুদ্ধের আশ্রয় নিতেন। ইসলামের যুদ্ধনীতি বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিগোচর হলে কখনো তারা একথা বলার সাহস পেত না যে, ইসলাম তলোয়ারের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। ইসলাম যুদ্ধ সংক্রান্ত বহুবিধ নীতি ও শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সংক্ষেপে একটি মাত্র বিষয় আমি এখানে বর্ণনা করছি।

শরীয়তের এ নীতির ওপর খুলাফায়ে রাশিদীনও সর্বদা আমল করেছেন যে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যদি কোন লোক তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই তথা আত্মীয়কে হত্যা করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত রক্তপাত করতে থাকে এবং তারা কখনও পরাস্ত হলে তোমরা তার প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে এমতাবস্থায় যদি সে মুখে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" উচ্চারণ করে, তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দাও। এমনকি যদি তোমার পূর্ণ বিশ্বাসও হয় যে, সে শুধু প্রাণ ভয়ে কালেমা পড়ছে অন্তরে আদৌ বিশ্বাস করেনি, তবুও সাথে সাথে তলোয়ার সরিয়ে নাও। এমনকি যদি বিদপমুক্ত হয়ে সে অন্য সময় তোমাদের হত্যা করবে বলে প্রবল আশংকাও থাকে তবুও। পরে যা হয় হবে কিন্তু ঐ মুহূর্তে তাকে হত্যা করা আদৌ জায়েয নয়। সুতরাং যে আদর্শ আত্মরক্ষার এমন অমোঘ ব্যবস্থা অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে তার পরেও কি কেউ সে আদর্শ সম্পর্কে বলতে পারে যে, ইসলাম বাহুবলে বা তলোয়ারের জোরে প্রচারিত হয়েছে? বলা বাহুল্য, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ইসলামের এ নীতি পুরোপুরি মেনে চলেছেন।

হরমুযান নামক এক ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল। অবশেষে বন্দী অবস্থায় তাকে হযরত উমর (রা)-এর দরবারে হাযির করা হয়। তিনি তার সামনে ইসলাম পেশ করলে ইসলাম গ্রহণ করতে সে অস্বীকার করে। ফলে তিনি

তাকে হত্যা করার হুকুম দেন। প্রতারণামূলকভাবে সে আরজ করলো ঃ "হত্যা তো আপনি করবেনই কিন্তু একটু পানি আনিয়ে দিন।" তাঁর হুকুমে পানি আনা হলো। তখন সে বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে পানিটুকু পান করার পূর্বেই জল্লাদ আমার উপর তরবারি চালিয়ে দেবে।" তিনি বললেন—"না, পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যা করা হবে না।" একথা শোনামাত্র সে পানিটুকু মাটিতে ঢেলে দিয়ে বলল—"আর আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। কেননা এখন এ পানি পান করা সম্ভব নয়, অথচ তা পান না করা পর্যন্ত আমাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে।" তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল উমর (রা)-এর স্বীয় ফরমান—"পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যা করা হবে না"-এর ভিত্তিতে অবশ্যই তাকে হত্যা করা হবে না। এ ঘটনার পরক্ষণেই সে ইসলাম গ্রহণ করে নিল। যেহেতু সে লক্ষ করলো যে, বাস্তবিকই এটা সত্য দীন যাতে শত্রুর সাথে পর্যন্ত এরূপ নীতিভিত্তিক ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করা হয়।

এ ঘটনা উল্লেখ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলো—ইসলামের শিক্ষা ও নীতি তুলে ধরা। খুলাফায়ে রাশিদীন এ নীতি এমনভাবে কার্যকর করেছেন যার কোন নজীর আজ পর্যন্ত কেউ পেশ করতে পারেনি। অবশ্য পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহ্দের কার্যকলাপের জন্য আমরা দায়ী নই। অন্যায়-অত্যাচার করে থাকলে তারা নিজেরা তার পরিণাম ভোগ করবেন। আমাদের মহান পূর্ব-পুরুষগণ এসব নীতি যথাযথভাবেই মেনে চলেছেন। ফলে তাঁরা মর্যাদার এত উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিলেন যে, কোন জাতির ভাগ্যে তা জোটেনি। সাহাবীগণের রীতি-নীতি বিজাতীয়দের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, অনেকে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেও তাঁদেরকে দেখার পর মুসলমান হয়ে গিয়েছে। —শুয়াবুল ঈমান, পৃ. ১৪৪

উত্তর ঃ (গ) মানুষ দুর্নাম রটায় যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে। আল্লাহ্র কসম, এটা সর্বৈব মিথ্যা। মুসলমানগণ অস্ত্রবলেই যদি মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করে থাকে, তবে ছয় শ' বছর শাসন করার পর ভারতে আজ একজন হিন্দুও দেখা যেত না। এ প্রশ্নের জবাবে দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম (র) বলেছেন ঃ তরবারির জোরেই যদি ইসলাম প্রচারিত হয়ে থাকে, তবে বল—সে অস্ত্রধারী এল কোত্থেকে? কেননা তলোয়ার নিজেই তো আর চলতে পারে না। সুতরাং প্রথম যারা তলোয়ার চালিয়েছিলেন, অবশ্যই তাঁরা তার ভয়ে মুসলমান হন নাই। কেননা সর্বপ্রথম অস্ত্রধারীই কেউ ছিলেন না। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইসলাম অস্ত্রের জোরে প্রচারিত

হয়নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল হুযূর আকরাম (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর। আর মদীনাবাসীদের অধিকাংশই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে কোন্ তলোয়ার তাদেরকে মুসলমান করেছিল ? আর মক্কাতে যে কয়েক শ' লোক মুসলমান হন এবং কাফিরদের অত্যাচারে নিপিষ্ট হতে থাকেন, তাঁরা কোন্ তলোয়ারের ভয়ে মুসলমান হয়েছিলেন ? মদীনায় হিজরতের পূর্বে সাহাবীগণের একটি অংশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, সেখানে কুরাইশী কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। আবিসিনীয় সম্রাট নাজ্জাসী হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা)-এর মুখে কুরআনের শাশ্বতবাণী শুনে অঝরে কেঁদেছিলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালাত এবং কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদান করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কে তাঁর উপর অস্ত্র ধরেছিল ? ইতিহাসে এ ধরনের শত শত প্রমাণ রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইসলাম কেবল আপন ন্যায়নীতির জোরেই প্রচারিত হয়েছে। বিশেষত আরবের যুদ্ধবাজ গোত্রসমূহের নিকট 'মরা' আর 'মারা' ছিল সাধারণ ব্যাপার। কোন মতবাদের নিকট নতি স্বীকার করে স্বীয় ধর্মমত ত্যাগ করা ছিল তাদের জন্য কলংকের বিষয়। সুতরাং এহেন আরবদের পক্ষে অস্ত্রের মুখে ইসলাম গ্রহণ করা কল্পনা করা যায় না।

প্রশ্ন হতে পারে, তা হলে জিহাদ ফরয হলো কেন ? উত্তরে বলতে চাই এবং বিষয়টি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, ইসলামের হিফাজত ও নিরাপত্তার জন্যই জিহাদের ব্যবস্থা, প্রচারের জন্য নয়। দু'টি বিষয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য যা চিহ্নিত করতে না পারার কারণে মানুষ ভ্রান্তিতে পড়ে আছে।

বস্তুত জিহাদকে অস্ত্রোপচারের সাথে তুলনা করা চলে। কেননা রোগ-জীবাণু দু'রকম হয়ে থাকে। (১) সংক্রামক, (২) অসংক্রামক। দ্বিতীয় প্রকারের রোগের বেলায় মলম কিংবা মালিশ ব্যবহারে নিরাময় হয়ে যায়। কিন্তু প্রথমটির বেলায় রোগের জীবাণু ধ্বংস করার জন্য অস্ত্রোপচারের আশ্রয় নিতে হয়। তদ্রূপ ইসলামের দুশমনও দু'ধরনের হয়ে থাকে। কোন শত্রুর সাথে সন্ধি করে নিলেই তারা মুসলমানদের উপর অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থাকে। কাজেই তাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু কোন কোন শত্রু এমনই হিংস্র হয় যে, তারা সন্ধিতে আসতে রাযী নয়। ফলে তখন সংক্রামক ব্যাধির মত অস্ত্রোপচার অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরি নাম জিহাদ। এর দ্বারা মানুষকে মুসলমান বানানো উদ্দেশ্য নয় বরং মুসলমানদের হিফাজত করাই জিহাদের মুখ্য বিষয়। মানুষ বাদশাহ্ আলমগীর

(র)-এর দুর্নাম রটনা করে যে, তিনি বলপূর্বক হিন্দুদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। এ অভিযোগ নিতান্ত ভুল ও মিথ্যা। বস্তুত তিনি ছিলেন শরীয়তের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং একজন পরহেযগার ও মুত্তাকী ব্যক্তি। এক হাজার তিনটি হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। স্বহস্তে কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করে তার হাদিয়াস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ ছিল তাঁর আয়ের একমাত্র উৎস। এরই দ্বারা তিনি সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন, রাজকোষ থেকে এক কপর্দকও তিনি ব্যক্তিগত ও সাংসারিক প্রয়োজনে গ্রহণ করতেন না, আর لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (দীনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই)-এর হুকুম তাঁর সামনে মওজুদ ছিল। এর পরিপন্থী কাজ তাঁর দ্বারা কেমন করে সংঘটিত হতে পারে ? এতো গেল অতীতের ঘটনা। সে কথা বাদ দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা বেশ—বর্তমানে ভারতের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করে, তারা কেন মুসলমান হয় ? তাদের উপর কোন্ অস্ত্র, কোন্ শক্তি ক্রিয়াশীল ? এখন তো তাদের উপর নিশ্চয়ই কোন শক্তির চাপ নেই, ক্ষমতার দাপট নেই। বরং সবদিক থেকেই তারা স্বাধীন ও মুক্ত। আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে কোনরূপ লোভও দেখানো হয় না। বৈষয়িক লোভ দেখাবার মত সামর্থ্যই বা মুসলমানদের কোথায়! পক্ষান্তরে বাস্তব সত্য এই যে, আজ যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে পরের দিনই তার নিকট দীনী কাজের জন্য চাঁদা চাওয়া হয়। আর ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তে কেউ যদি অর্থ সাহায্যের আবেদন জানায়, তার প্রতি আমাদের পরিষ্কার জবাব—নিজের নাজাতের জন্য তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে করতে পার নতুবা টাকার লোভ দেখিয়ে তোমাকে মুসলমান বানানোর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। অবশ্য (ঈমানের) যে সম্পদ আমরা তোমাকে দান করছি তার বিনিময়ে তুমিই যদি আমাদেরকে নজরানা দান কর, তবে তা-ই হবে যথার্থ। কিন্তু এ স্বাধীনতা ও বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। আর মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যেন হারানো মানিক হাতে পেল। কোন এক হিন্দু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর প্রেমে এত কাঁদত যা বর্ণনার অতীত। সে বলত ঃ আল্লাহ্র প্রকৃত পরিচয় এখন আমি জানতে পেরেছি। সার কথা, তার মধ্যে এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। —মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ৭৮

প্রশ্ন ঃ ২. আল্লাহ্ কি কাফিরদেরকে ক্ষমা করতে সক্ষম নন ?

উত্তর ঃ ইসলাম এমন বিষয় যার মাধ্যম ছাড়া নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। এর অর্থ আবার এই নয় যে, আল্লাহ্ পাক কাফিরদের ক্ষমা করতে সক্ষম নন। বরং এর মর্ম হলো—তাদের মাগফেরাত বা পারলৌকিক মুক্তি তাঁর কাম্য নয় যদিও তিনি

মুক্তিদানে অবশ্যই সক্ষম। অন্যথায় "কাফেরকে শাস্তি দানে তিনি বাধ্য" একথা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বাধ্য হওয়া তাঁর সত্তার অনিবার্যতার পরিপন্থী। ঈমান ও ইসলাম ব্যতীত কারো ক্ষমা আল্লাহ্‌র নিকট কাম্য নয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِـهٖ ۔

—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক করাকে আদৌ ক্ষমা করবেন না।

এখানে কারো মনে হয়তো সন্দেহ হতে পারে যে, আয়াতে তো কেবল মুশরিকদের কথাই বলা হয়েছে, কাফেরদের সম্পর্কে নয়। অথচ কোন কোন কাফের এমনও আছে যারা মুশরিক নয়, বরং মুয়াহ্‌হিদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসী, কিন্তু ইসলামকে অস্বীকার করে। সুতরাং তাদের যে ক্ষমা হবে না আলোচ্য আয়াতে এরই উল্লেখ কোথায় ? এ পর্যায়ে—

اِنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَـارِ جَهَنَّمَ خَالِـدِيْنَ فِيْهَا اُوْلٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّـةِ ۔

—আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করে তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে, তারাই হলো নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।

আয়াতে লক্ষণীয় যে, এতে কাফেরকে আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের অংশ বলা হয়েছে আর উভয়ই অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এর দ্বারাও কাফেরদের ক্ষমা না পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে আরো একটি সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, আয়াতে কেবল 'খুলূদ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ—"দীর্ঘদিন অবস্থান করা"। এর দ্বারা 'দাওয়াম' তথা চিরকাল অবস্থান করা বোঝায় না ? এর জবাব হলো—'দাওয়াম' শব্দটি 'খুলূদের' পরিপন্থী নয়। কাজেই কোন নিদর্শন পাওয়া গেলে খুলূদ শব্দটি দাওয়াম অর্থে ব্যবহৃত হতে কোন অসুবিধে নেই। আর এখানে খুলূদ শব্দটি যে দাওয়াম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার ইঙ্গিত বা নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তা হলো মুশরিকদের বেলায় খুলূদ অর্থ দাওয়ামই নির্ধারিত। দ্বিতীয়ত, আয়াতে কাফের ও মুশরিক উভয়ের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। কাজেই মুশরিকের ক্ষেত্রে যখন খুলূদ অর্থ দাওয়াম সুতরাং কাফেরের ক্ষেত্রেও একই অর্থ প্রযোজ্য। অন্যথায় বাক্যের একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ও একাধিক অর্থ প্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ে, যা সিদ্ধ নয়। তদুপরি কোন কোন আয়াতে কাফেরের বেলায় খুলূদকে দাওয়াম অর্থে বিশেষিতও করা হয়েছে।

সুতরাং বলা হয়েছে ঃ

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ - الى قوله تعالى : كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۔

—যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক........ যখনি তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনি তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۔

—যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্‌র পথে আসতে মানুষকে নিবৃত্ত করে অতঃপর কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

সুতরাং এর দ্বারা কাফেরের শাস্তি চিরকালীন হবে বলে প্রমাণ হয়, যদ্দ্বারা তার ক্ষমা না হওয়াই প্রতীয়মান হয়ে যায়। এখানে সম্ভাব্য অপর একটি প্রশ্নের জবাবও হয়ে যায়। প্রশ্নটি হলো ঃ "কাতেলে আমাদ" অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا ۔

—কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়িভাবে থাকবে।

কাজেই এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর তওবা কবূল হওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়। এর জবাব হলো—আলোচ্য আয়াতে খুলূদ শব্দটি কোন বিশেষণ ছাড়াই উল্লেখিত হয়েছে। আর খুলূদ শব্দটি দাওয়াম অর্থে গ্রহণ করা আবশ্যিক নয়। দ্বিতীয়ত, দাওয়াম অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য কোন নিদর্শনও এখানে নেই। সুতরাং আয়াতের মর্ম এতটুকুতেই সীমিত রাখতে হবে যে, কাতেলে আমাদ দীর্ঘদিন ব্যাপী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে এবং দীর্ঘদিন পরে হলেও অবশেষে এক সময় সে মুক্তি পাবে। অতএব, সে যখন মুক্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত হচ্ছে তখন তার তওবা কবূল হওয়াও যুক্তিযুক্ত। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতভেদ রয়েছে। তাঁর মতে, কাতেলে আমাদের তওবা কবূলযোগ্য নয়। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীর মতে তার তওবা গ্রহণযোগ্য। অতঃপর তাবেয়ীন, তাবা' তাবেয়ীন এবং ইমামগণের এ ব্যাপারে ইজ্‌মা' বা

সর্বসম্মত মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তার তওবা কবুলযোগ্য যদি তা শরীয়তের বিধানানুসারে হয়। বস্তুত শরীয়তের মূলনীতি রয়েছে যে, পরবর্তীগণের ইজমা দ্বারা পূর্ববর্তীগণের মতভেদ দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং বিষয়টি এখন ইজমার ভিত্তিতে সর্বজনস্বীকৃত। পক্ষান্তরে কাফের ও মুশরিকদের ব্যাপারে অপর এক আয়াতে খুলূদের সাথে দাওয়ামেরও উল্লেখ রয়েছে। কাজেই তাদের বেলায় মাগফিরাতের কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। কেননা খুলূদ অর্থ দীর্ঘদিন অবস্থান করা। আর 'আবাদ' বলা হয় যার কোন শেষ বা অন্ত নেই। সার কথা, কাফের বা মুশরিকরা জাহান্নামে এত দীর্ঘদিন অবস্থান করবে যে, তার কোন শেষ বা অন্ত নেই। বস্তুত কুফর বলা হয়—ইসলামের বিপরীত জিনিসকে, এর সাথে শির্কযুক্ত থাকুক বা না থাকুক। উভয়ের শাস্তিই অনন্তকালব্যাপী জাহান্নামবাস। অতএব, ইসলাম পরিত্যাগ করার সাজা যখন এই, তখন এর দ্বারাই ইসলামের ফযীলত, মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। —মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ১৭

প্রশ্ন ঃ ৩. জিহ্বা ছাড়া আল্লাহ্ পাক কিভাবে কথা বলেন ?

উত্তর ঃ একজন হিন্দু যোগী অপর এক হিন্দু পণ্ডিতসহ একবার আমার কাছে আসেন এবং প্রশ্ন করেন ঃ আপনারা কুরআন শরীফকে "আল্লাহ্র কালাম" নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু জিহ্বা ছাড়া কালাম হতে পারে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার জিহ্বা নেই। তাহলে তিনি কিভাবে কালাম করলেন ? জবাবে আমি বললাম—কথা বলার জন্য অবশ্য জিহ্বার প্রয়োজন কিন্তু স্বয়ং জিহ্বার কথা বলার জন্য জিহ্বার প্রয়োজন নেই। সে তার নিজের সত্তা বলে কথা বলে থাকে। তেমনি আমরা কান দ্বারা শুনে থাকি কিন্তু কান তার নিজ ক্ষমতায়ই শুনে থাকে। এজন্য তার অন্য কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। দেখার জন্য আমাদের চোখের প্রয়োজন। কিন্তু চোখের কোন চোখের প্রয়োজন পড়ে না, সে তার আপন ক্ষমতায় দেখে থাকে। তাই জবান বা জিহ্বা যখন জিহ্বা ছাড়া কথা বলতে সক্ষম অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলারও কথা বলার জন্য কোন কিছুর সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না। তাই সিফাতে কালাম বা কথা বলার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য স্বয়ং তাঁর সত্তায় বিদ্যমান থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়। তাঁর সত্তা থেকে বিনা যবানে কালাম বা কথা জারি হয়ে থাকে। এ জবাব শুনে সে হিন্দু ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গীকে বলতে লাগলেন ঃ "দেখ, একেই বলে ইল্ম বা জ্ঞান।" তিনি আরো বললেন ঃ ইতিপূর্বে এমন উত্তর আমার কল্পনায়ও ছিল না। আলহামদু লিল্লাহ্! আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উপস্থিত ক্ষেত্রে এ জবাব আমার কল্পনায় হাযির হয়ে যায়। —মুজাদালাতে মা'দিলাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩

প্রশ্ন ঃ ৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফ্রীর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব কেন? অথচ অপরাধের মাত্রা অনুপাতে শাস্তি হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ (ক) এর জবাবে বলা যায়—"অপরাধের মাত্রা অনুপাতে শাস্তি হওয়া উচিত" আপনার এ যুক্তি স্বীকৃত। কিন্তু 'ঔচিত্যের' অর্থ কি এই যে, অপরাধ ও শাস্তির সময়কালও একই মাত্রা এবং সমপরিমাণের হতে হবে ? যদি তাই হয়, তবে একস্থানে দু'ঘন্টা ডাকাতির পর ডাকাতকে গ্রেফতার করে আনা হলে বিচারক কি তাকে সে অনুপাতে মাত্র দু'ঘন্টার সাজাই দেবেন ? বিচারক যদি তাই করেন তবে আপনি কি তাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে নেবেন ? আর এটা অপরাধ অনুপাতে বিচার হয়েছে বলে স্বীকার করে নেবেন ? আদৌ নয়। এতে বোঝা গেল যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের অর্থ এই নয় যে, উভয়টির সময়কালও সমপরিমাণ হতে হবে। বরং এর অর্থ এই যে, অপরাধের গুরুত্ব অনুপাতে শাস্তি বিধান করতে হবে। এখন পাঠকবর্গই বিবেচনা করুন, শরীয়ত কুফরীর যে শাস্তি বিধান করেছে তা কুফরীর মতো গুরুতর অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে কি-না। আর এ অপরাধ মারাত্মক কিনা ? হয়তো আপনারা বলতে পারেন, অপরাধ তো মারাত্মক বটে কিন্তু এত জঘন্য নয় যে, তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম হতে হবে। তাহলে আমি বলতে চাই যে, আপনারা শুধু কর্মের বাহ্যিক দিকের প্রতি নজর করার ফলেই আপনাদের এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সাজা ও প্রতিফলের ভিত্তি কেবল বাহ্যিক অবস্থার উপর স্থাপিত নয়। এখানে উদ্দেশ্যেরও একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বরং এক ধাপ উপরে উঠে একথাই বলা সঙ্গত যে, 'উদ্দেশ্যই' হলো এক্ষেত্রে মূল ভিত্তি। সুতরাং কেউ যদি ধোঁকায় পড়ে শরাব পান করে, তবে তার গুনাহ্ হবে না। যদিও বাহ্যত এতে গুনাহের রূপ বিদ্যমান। কেননা এক্ষেত্রে তার নিয়ত ছিল না। পক্ষান্তরে কেউ যদি শরাব পানের উদ্দেশ্যে মদের দোকানে যায় আর দোকানদার মদের পরিবর্তে অন্য কোন শরবত তার হাতে তুলে দেয় আর শরাব মনে করে সে তাই পান করে তবে সে গুনাহ্গার হবে। কেননা তার উদ্দেশ্য ছিল শরাব পান করা। এ কারণে ফকীহগণ বলেছেন ঃ কোন লোক যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে আর অন্ধকারে সে মনে করে এ আমার স্ত্রী নয়, বরং অন্য পর নারী, তবে গুনাহ্গার হবে। অনুরূপভাবে সহবাসকালে যদি মনে মনে ধারণা করে যে, আমি অমুক নারীর সাথে সহবাস করছি আর কল্পনায় তার চিত্র ফুটে ওঠে এবং কামনার স্বাদ আস্বাদন করে এমতাবস্থায় সে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে কারো বাসর ঘরে বাড়ির মহিলাগণ যদি তার স্ত্রীর পরিবর্তে ভুল করে অন্য কোন মেয়েকে পাঠিয়ে দেয় আর সে আপন স্ত্রী মনে করে তার সাথে সহবাস

করে, তবে এতে তার গুনাহ্ হবে না এবং এ সহবাস যিনার অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং "ওয়াতী বিশ্শুবাহ" অর্থাৎ "সন্দেহযুক্ত সহবাস" রূপে গণ্য হবে। এর দ্বারা তার বংশধারা প্রমাণিত হবে এবং মেয়েটির উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। এ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর জেনে নিন, কাফেরের কুফরী দৃশ্যত যদিও নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার নিয়ত ছিল এই যে, যদি বেঁচে থাকি তবে চিরদিন এ অবস্থায়ই জীবন কাটিয়ে দেব। কাজেই তার নিয়ত অনুযায়ী চিরকাল তাকে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে। তেমনি মুসলমানের ইসলাম যদিওবা সময়ের আবর্তে গণ্ডিভুক্ত কিন্তু যেহেতু তার উদ্দেশ্য হলো এই যে, যদি চিরদিন বেঁচে থাকি, তবে ইসলামের উপরই কায়েম থাকব। কাজেই এর প্রতিদানস্বরূপ চিরদিন সে জান্নাতে বাস করবে।

উত্তর ঃ (খ) অপর একটি সূক্ষ্ম জবাব হলো, কুফরীর ফলে আল্লাহ্র হক (حقوق الله) বিনষ্ট হয়। আর আল্লাহ্র হক সীমাহীন। তাই এর সাজাও সীমাহীনই হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে ইসলাম দ্বারা আল্লাহ্র হক পালন ও আদায় করা হয় আর তাও অসীম। তাই এর প্রতিদানও অসীম হওয়া উচিত। আলহামদুলিল্লাহ্, এর দ্বারা এ প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা হয়ে গেল। —মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ২০

প্রশ্ন ঃ ৫. মুসলমানগণ কা'বা ঘরের পূজা করে থাকে।

উত্তর ঃ কা'বাঘরের পূজা নয় বরং আমরা কেবলামুখী হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করি মাত্র। এর বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ আমাদের রয়েছে।

(ক) আমরা নিজেরাই এর উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করি। বলা বাহুল্য পূজারী কখনো স্বীয় উপাস্যের উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করতে পারে না।

(খ) নামায পড়া অবস্থায় কারো মনে যদি কাবা ঘরের কল্পনা আদৌ না থাকে অথচ সে কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ে তবু তার নামায শুদ্ধ হবে। সুতরাং বহু লোক এমনও রয়েছে, যারা মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায পড়ে, কিন্তু কা'বাঘরের কথা আদৌ তাদের মনেই জাগে না, তা সত্ত্বেও তাদের নামায শুদ্ধ হয়। কা'বার ইবাদত করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হতো, তবে এর নিয়ত শর্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অথচ বাস্তব তা নয়।

(গ) কোন সময় যদি কা'বার অস্তিত্ব না-ও থাকে তবু নামায ফরয হওয়ার হুকুম বহাল থাকবে এবং সেদিকে মুখ করেই নামায আদায় করতে হবে। কাজেই মুসলমানরা পাথর ও ইটের ইবাদত করে না। অন্যথায় কোন সময় কা'বা ঘর বিনষ্ট হয়ে গেলে নামাযের হুকুম রহিত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

(ঘ) কা'বা ঘরের ছাদের উপর কেউ নামায পড়লে সেটাও জায়েয। সুতরাং কা'বা শরীফ যদি মুসলমানদের মা'বূদ হয়ে থাকে, তবে তার উপর চড়ে নামায পড়া জায়েয হতো না। কেননা এখন তার সামনে কিছুই নাই। দ্বিতীয়ত মা'বূদ তথা উপাস্যের উপর আরোহণ করা বে-আদবীর শামিল। তাই এমতাবস্থায় নামায সিদ্ধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু কা'বা শরীফের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া বিশুদ্ধ বলে ফকীহ্গণ মত প্রকাশ করেছেন। তবে কি এটা মা'বূদের ওপর আরোহণ করার সমতুল্য ? হয়তো বা প্রশ্নকারিগণ বিষয়টিকে নিজেদের সাথে তুলনা করে নিয়েছেন যে, একদিকে তারা গরু-গাভীকে দেবতা ও উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করে ; অপরদিকে এর উপর সওয়ারও হয়। এটা বিবেক বিরুদ্ধ কাজ।

এখন "ইসতিকবালে কিবলা" অর্থাৎ কেবলামুখী হওয়ার রহস্য হলো —একাগ্রতা ও মনের নিবিষ্টতা যা ইবাদতের প্রাণ, তার অবর্তমানে ইবাদত কেবল প্রাণহীন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানেরই সমষ্টিমাত্র। আর এটা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—সকল ধর্মমতের লোকই যা স্বীকার করে থাকেন। অধিকন্তু অন্তরে একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা সৃষ্টির অন্তরালে বাহ্যিক আকারের একটা কার্যকর ভূমিকা রয়েছে, সে কারণে নামাযে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখার আদেশ এবং অন্যত্র মনোযোগ দেয়া ও অনর্থ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তদুপরি কাতার সোজা করার হুকুম রয়েছে। কেননা কাতার বাঁকা হবার ফলে মন বিচলিত হয়ে ওঠে। সাধারণ লোকের অন্তর সম্ভবত এটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। যেহেতু নিবিষ্টতা তাদের মনে খুব কমই হয়ে থাকে। কিন্তু নামাযে একাগ্রতা যাদের অর্জিত হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন—কাতার সোজা না হবার ফলে তাদের মনে যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সূফী-সাধকগণ কসম খেয়ে বলেন—কাতার বাঁকা হলে অন্তর বিচলিত হয়ে পড়ে। একনিষ্ঠতা অর্জনের জন্যই সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ওপর তাকীদ করা হয়েছে। কেননা এদিক সেদিক দৃষ্টিপাতের দ্বারাও নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং নামাযে নির্দিষ্ট একটা দিক নির্ধারণ করা না হলে প্রত্যেকেই নিজের খেয়াল-খুশীমত যেকোন দিকে মুখ করে নামায পড়তে থাকবে। ভিন্নমুখী দিক ও আকৃতির ফলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই এই উদ্দেশ্যে বিশেষ একটা দিক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—তাহলে কা'বার দিকটাই নির্ধারণ করার কারণ কি ? দিকতো আরও রয়েছে ? এটা অবান্তর কথা—এ প্রশ্ন করার কারো অধিকার নেই। কেননা সব ক্ষেত্রেই এটা কেন হলো ? ওটা কেন হলো না? ইত্যাদি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। লক্ষ করুন, আদালত কর্তৃক বিচারকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাচারির একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয় যে, এতটা

থেকে এতটা পর্যন্ত অফিসের কাজকর্ম চলবে। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন কি ? জবাবে বলা হবে দু' কারণে—একেতো নির্দিষ্ট সময়ে সকল কর্মচারী যাতে উপস্থিত হতে পারে, দ্বিতীয়ত, জনসাধারণেরও যাতে জানা থাকে যে, কোর্ট অমুক সময় বসবে। কাজেই অন্য সময় ব্যক্তিগত কাজকর্ম সমাধা করে নিশ্চিন্তে সবাই যেন সময়মত উপস্থিত থাকতে পারে। পক্ষান্তরে সময় যদি নির্দিষ্ট করে দেয়া না হয়, তবে হাকিমের অপেক্ষায় সবাইকে সারাদিন কাচারিতেই পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু অফিসের জন্য দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত সময়টাই কেন নির্দিষ্ট করা হলো ? অন্য সময় হলেই বা ক্ষতি কি ছিল ? এখানে এ ধরনের প্রশ্নের কোন অবকাশই নেই। কেননা সময় যেটা-ই ঠিক করা হোক প্রশ্ন থেকেই যাবে। সুতরাং নামাযের জন্য কা'বার দিকটাই কেন নির্দিষ্ট করা হলো—এর ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করি না। অবশ্য একটা দিক নির্দিষ্ট করার গূঢ় রহস্য ও উপকারিতা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটা তো হলো প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক জবাব। কিন্তু একজন খোদাভক্তের সামনে জবাব হলো—কোন্ দিকটাতে আল্লাহ্ পাকের আকর্ষণ বেশি সেটা তিনিই সম্যক অবগত। তাই যে দিকে তাঁর আকর্ষণের মাত্রা বেশি ছিল সেটাকেই নামাযের জন্য দিক হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এর পরও কথা থাকে—এটা কি করে বোঝা গেল যে, কা'বার দিকেই তাঁর আকর্ষণ অধিক পরিমাণে রয়েছে ? এ পর্যায়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, বাস্তবিকই খোদায়ী নূরের তাজাল্লী তথা বিকিরণ কা'বার উপর অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। এটাই হলো আকর্ষণের অর্থ, যা কা'বার আসল প্রাণ। এ কারণেই কা'বাঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া বৈধ। কেননা এমতাবস্থায় যদিও কা'বার দৃশ্যমান আকৃতি সামনে থেকে অনুপস্থিত কিন্তু কা'বার আসল প্রাণ তথা খোদায়ী নূরের বিকিরণ সামনে রয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, মুসলমানগণ কা'বাঘরের দেয়াল নয় বরং খোদায়ী তাজাল্লীকে সামনে রেখেই নামায পড়ে। কিন্তু সবাই যেহেতু এটা অনুভব করতে সক্ষম নয়, কাজেই মহান আল্লাহ্ নির্দিষ্ট একটা স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছেন, অন্যান্য স্থানের তুলনায় যার ওপর তাঁর নূরের বিকাশ-বিকিরণ অধিক পরিমাণে ঘটে থাকে। সুতরাং এ ভবনটি কেবল সে মহিমাময় তাজাল্লীর প্রকাশকেন্দ্র মাত্র। নতুবা ভবনটি কোন মূল উদ্দেশ্য নয় বা এর কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। এ জন্যই কা'বাঘর কখনো বিলীন হয়ে গেলে নামায রহিত হবে না। এর ছাদের উপর নামায পড়া বিশুদ্ধ হওয়াটাই এর প্রমাণ। ফকীহ্গণ এ রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। কাজেই তাঁরা বলেন— প্রকৃতপক্ষে কেবলা হলো কা'বাঘরের সমান্তরালে ঊর্ধ্বাকাশ থেকে পাতালের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু কা'বার ভবন

এবং স্থান খোদায়ী নূরের তাজাল্লীর সাথে সম্পৃক্ত হবার কারণে এটাও বরকতময় স্থানে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৬. চুম্বনের মাধ্যমে মুসলমানগণ হাজরে আসওয়াদের ইবাদতে লিপ্ত হয় না কি ?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে পাথর চুম্বন করাটা মূলত শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয় বরং এটা মহব্বত ও ভালবাসার প্রতীক। যেমন মানুষ স্ত্রী-সন্তানকে চুমো খেয়ে থাকে। চুম্বন করা যদি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়, তবে প্রত্যেকেই আপন স্ত্রীর ইবাদত করে থাকে। অথচ এটা একেবারে অবান্তর কথা। কাজেই বোঝা গেল, চুম্বন করা দ্বারা ইবাদত করা ও সম্মান প্রদর্শন করা প্রমাণ হয় না। বরং ভালবাসার কারণেও চুম্বন হতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে—হাজরে আসওয়াদকে আপনারা ভালবাসেন কেন? এর জবাবে আমার কথা হলো—এটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা প্রতিপক্ষের অধিকার বহির্ভূত। লক্ষ করুন, কোন ব্যক্তি যদি এ মর্মে আদালতে মামলা দায়ের করে যে, আমি অমুক বাড়ির মালিক ও স্বত্বাধিকারী, তখন তার নিকট প্রমাণ চাওয়া হবে। সে যদি প্রমাণ উপস্থিত করতে সক্ষম হয় তাহলে প্রতিপক্ষের এ দাবি উত্থাপনের অধিকার নেই যে, স্বীকার করে নিলাম বাড়ি তোমারই কিন্তু এর ভিতর কি কি মালামাল রয়েছে সেগুলোও তোমাকে শনাক্ত করতে হবে। অথবা কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে চুম্বন করাতে "একাজ কেন করলে ?" তাকে এ প্রশ্ন করা হলে—সে যদি উত্তরে বলে "ভালবাসার আবেগে, প্রীতির মোহে" তখন তার প্রতি এ প্রশ্ন অবান্তর—"স্ত্রীর প্রতি তোমার অনুরাগ কেন ? দিন-রাত কতবার তুমি চুমো খেয়ে থাক ?" এর অর্থ এটা নয় যে, হাজরে আসওয়াদকে ভালবাসার কারণ ব্যাখ্যা করতে আমরা অপারক। বরং প্রতিপক্ষের প্রশ্ন করার অধিকারের সীমা পর্যন্তই উত্তর সীমিত হওয়া উচিত। অধিকার বহির্ভূত প্রশ্নের জবাব না দেয়া-ই সমীচীন। এক্ষেত্রে তাকে পরিষ্কার বলে দেয়া উচিত, এ ধরনের প্রশ্ন করার তোমার কোন অধিকার নেই। কেননা বিরুদ্ধবাদীদের বোধশক্তি সকল কথার রহস্য অনুধাবনের যোগ্য নয়। সূক্ষ্ম বিষয় তাদের সামনে ব্যক্ত না করাই উত্তম। কেউ কেউ বিস্মিত হয় যে, এমন কোন কারণ রয়েছে যা আমরা বুঝতে অক্ষম, আমরাও তো মানুষ ? সূক্ষ্ম বিষয় ব্যক্ত করা হলে আমরা তার মর্ম বুঝতে না পারার কোন কারণ থাকতে পারে না। আমি বলতে চাই যদি তা-ই হয়, তবে কোন গণিতজ্ঞের কাছে আমার অনুরোধ—অংকের সূত্র ও প্রাথমিক নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ একজন মূর্খ লোককে উকলিদাসের একটি ফর্মূলা বুঝিয়ে দেয়া হোক। নিশ্চয়ই তিনি স্বীকার করবেন যে,

এমন ব্যক্তিকে উকলিদাসের ফর্মূলা বুঝানো সাধ্যের অতীত। কিন্তু কেন ? সেকি মানুষ নয় ? বস্তুত কথা হলো—এমন এমন বিষয়ও রয়েছে যা বুঝতে হলে সর্বাগ্রে এর আনুষঙ্গিক ভূমিকা, কতগুলো প্রাথমিক সূত্র ও ধারা জেনে নেয়া অপরিহার্য। সে সবের জ্ঞান লাভের পর-ই কেবল কোন ব্যক্তি বিষয়টি বুঝে উঠতে পারে। ব্যক্তি মাত্রই যে সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করতে পারে না—এটা অতি সাধারণ কথা। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, আজকালের তথাকথিত জ্ঞানবানরা এ মোটা কথাটা বুঝতে চান না। যাহোক, এ পর্যায়ে এর আনুষঙ্গিক রহস্য আমি বর্ণনা করছি। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এটা মূলত সম্মান কিংবা ইবাদত হিসেবে করা হয় না, বরং হৃদয়ের একান্ত আবেগ-অনুরাগই এর পিছনে ক্রিয়াশীল। সুতরাং হযরত উমর (রা) এক বিরাট সমাবেশে এর রহস্য উন্মোচন করেছেন। একদল গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে একবার তওয়াফ করার কালে চুম্বনের উদ্দেশ্যে হাজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়িয়ে তিনি বললেন ঃ

انی لاعلم انك الحجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قبلك ما قبلتك ۔

—আমি জানি তুমি একটি শিলাখণ্ড মাত্র। কারো কোন ক্ষতি বা উপকার করতে অক্ষম। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমিও তোমাকে চুমো দিতাম না।

পাথরটির সাথে এটি একটি নিষ্ঠুর ব্যবহার বৈ কিছু নয়। তাই যদি এটা মুসলমানদের মা'বূদই হতো তবে কি—"তুমি ক্ষতি কিংবা উপকারের অধিকারী নও" বলে সম্বোধন করা সঙ্গত ছিল ? এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, একান্ত ভালবাসাই এর মূল রহস্য। সে অনুরাগের কারণ হলো—মহানবী (সা) স্বয়ং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছেন। বস্তুত মহানবী (সা)-এর মলত্যাগের স্থানটিও যেখানে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় সেক্ষেত্রে যেস্থান কেবল তাঁর হাতের পরশেই ধন্য হয়নি; এমনকি ওষ্ঠ মোবারকের ছোঁয়াও ভাগ্যে জুটেছে, সে স্থানের প্রতি হৃদয়ের অনাবিল অনুরাগ যে কি পরিমাণ সে কথা বলাই বাহুল্য। কবির ভাষায় ঃ

یا امید آنکه جانان روزے رسیده باشد
یا خاك استانش داریم جبهه رسائی

—কোন একদিন মিলন ঘটবে এ আশায় প্রেমাষ্পদের আস্তানায় আমি মাথা ঠুকছি অবিরত।

এখন তিনি "চুম্বন কেন করলেন ?" এ প্রশ্নের অধিকার কারো নেই। আর এর কারণ ব্যাখ্যা করাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে, মহানবী (সা) হাজরে আসওয়াদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইবাদতের নিয়তে চুম্বন করেন নি। নতুবা হযরত উমর (রা) নির্ভয়ে একথা বলতে পারতেন না যে, لا تضر ولا تنفع (তুমি কারো ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম নও)। কেননা হুযূর (সা)-এর মন-মানসিকতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিই অবগত ছিলেন। তা সত্ত্বেও পাথরের সাথে যখন তাঁর এ ব্যবহার, কাজেই এ মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সা) কর্তৃক পাথরকে চুম্বন করা নিশ্চয়ই ইবাদত হিসেবে ছিল না। প্রসঙ্গত এর জবাবে বলা যায় যে, সম্ভবত মহানবী (সা) বায়তুল্লাহ্‌র অন্য অংশের তুলনায় হাজরে আসওয়াদের উপর খোদায়ী নূরের তাজাল্লী ও বিকিরণ অধিক পরিমাণে লক্ষ করেছিলেন। সুতরাং নূরের তাজাল্লীর সাথে নিবিড় সম্পর্কই এ চুম্বনের মূল কারণ। আর প্রেমাষ্পদের নূরের জ্যোতির সাথে সম্পৃক্ত বস্তুকে চুম্বন করাটা প্রেমের স্বাভাবিক নিয়ম ও চাহিদা। কবির ভাষায় ঃ

امر على الديار ديارليلى - اقبل ذا الجدار وذا الجدار
وساحب الديار شغفن قلبى - ولكن حب من سكن الديار

—প্রেমিকা লাইলীর বাড়ি আর অলি-গলিতে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি আর এ দেয়াল সে দেয়ালে চুমো খাচ্ছি। নিছক বাড়ির প্রেম আমার মনকে উদাস করেনি বরং উতলা হয়েছি এর বাসিন্দার প্রেমে।

প্রশ্ন ঃ ৭. ইসলামের দাসপ্রথা আপত্তিকর।

উত্তর ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম হলো "তোমার গোলামের সত্তরটি অপরাধ থাকলেও তাকে ক্ষমা করে দাও ; আরো অধিক হলে লঘুদণ্ড প্রদান কর।" কোন অমুসলমান গোলাম তো দূরের কথা আপন সন্তানের সাথেও এ ধরনের বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করতে কখনো দেখা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এত সব সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিরোধীদের পক্ষ থেকে ইসলামের দাসপ্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতে চাই যে, গোলামদের সাথে ইসলাম যে আচরণ দেখিয়েছে, কোন পিতা আপন সন্তানদের সাথেও তা করতে সক্ষম নয়। বস্তুত একমাত্র ইসলামই এমন বিধান দিয়েছে যার ফলে সমাজের একাংশ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির সন্ধান পেয়েছে। মনে করুন শত্রুদল কর্তৃক যদি মুসলমানগণ আক্রান্ত হয়, অথচ একই শত্রুপক্ষীয় হাজার হাজার লোক তখন তাদের হাতে বন্দী, এখন বলুন এদের সম্পর্কে সঙ্গত আচরণ কি হওয়া

উচিত ? প্রথমত এদেরকে যদি মুক্তি দেয়া হয়—তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যুদ্ধাবস্থায় নিজেদের মুকাবিলায় লক্ষ-হাজার সৈন্য দ্বারা শত্রুবাহিনীকে নববলে বলীয়ান করে দেয়া, যা নিছক বোকামিরই নামান্তর। দ্বিতীয়ত, সাথে সাথে তাদেরকে হত্যা করে ফেলা। এমতাবস্থায় দাসত্বের ব্যাপারেই যেখানে বিপক্ষীয়দের এত আপত্তি, সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে যেত যে, দেখ ইসলামের বিধান কত নির্মম ও বর্বরোচিত যে, মুহূর্তে বন্দীদের প্রাণ সংহার করে ফেলা হয়েছে। তৃতীয়ত, তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে সেখানেই বন্দী হিসাবে তাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা। এ ব্যবস্থা যদিও বর্তমানের কোন কোন উন্নত ও ধনী দেশের পসন্দনীয়, কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। একে তো এর ফলে রাষ্ট্রের উপর বিরাট অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, এসব বন্দীকে উৎপাদনমূলক কাজে লাগিয়ে এদের শ্রমলব্ধ অর্থের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাপ অপেক্ষাকৃত কমিয়ে আনাটা একটা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা। অপরদিকে কয়েদীদের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক আমলা নিয়োগ করতে হয়, যাদেরকে শুধু একই কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখতে হবে, অন্য কোন কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তৃতীয়ত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে কারাবন্দীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও এসব তাদের নিকট মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হারানোর অনুভূতি এবং ক্রোধ এত তীব্র হয় যে, রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধার যথার্থ মূল্যায়নে তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসে। সুতরাং এতে রাষ্ট্রের টাকাও গেল, অথচ শত্রুর শত্রুতাও হ্রাস পেল না। অধিকন্তু কারাগারে আটক হাজার হাজার আদম সন্তান শিক্ষা ও সভ্যতা থেকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত হয়ে যায়, যা মানবতাবিরোধী অপরাধ। কাজেই ইসলাম ন্যায়ানুগ পন্থায় এদের সম্পর্কে বিধান জারি করেছে যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। ফলে একটি পরিবারে একটি গোলামের ব্যয়ভার বহন করা কোন সমস্যাই নয়। অপরদিকে রাষ্ট্রও বিরাট আর্থিক চাপ থেকে বেঁচে গেল। অতঃপর মনিব কর্তৃক স্বীয় গোলাম দ্বারা অর্থোপার্জন করানোর অধিকার স্বীকৃত ও আইনসিদ্ধ হওয়ার ফলে তার ভরণ-পোষণ মালিকের উপর আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। এমতাবস্থায় মালিকের অনুভূতি এটাই হবে যে, চাকরের পেছনে আমাকে একটা অংক ব্যয় করতে হতো, এখন না হয় সে পয়সাটা এর পেছনেই ব্যয় হলো; আর বিনিময়ে তাকে কাজে খাটিয়ে নেব। এ ক্ষেত্রে মানসিক একটা প্রশান্তিও রয়েছে। গোলাম যেহেতু বন্দীর তুলনায় চলাফেরা, ভ্রমণ ইত্যাদিতে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, তাই মনিবের বিরুদ্ধে তার

অন্তরে বিদ্বেষ ও ক্রোধের সঞ্চার হয় না। তদুপরি মনিব যদি তার প্রতি সদয় থাকে, বিনয় ব্যবহার করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়ে মনিবের বাড়িকে আপন বাড়ি এবং তার পরিবারকে আপন পরিবার মনে করতে থাকে। এটা কোন রূপকথা নয়। বাস্তব ঘটনা এর সাক্ষী। অধিকন্তু এহেন পরিবেশে শিক্ষা-সভ্যতায় উন্নতি করার পথ গোলামের জন্য সুগম হয়ে যায়। কারণ উভয়ের হৃদ্যতার ফলে মনিবের একান্ত ইচ্ছা থাকে আমার গোলাম শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি করুক, সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক। সে তাকে শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ এবং পারদর্শী করে তুলতেও যত্নবান হয়। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে লক্ষ করা যায় শত শত আলেম, ফাযেল, জ্ঞানী-গুণী, সূফী, আবেদ এমন রয়েছেন যাঁরা মূলত গোলাম ছিলেন। তাই গোলামশ্রেণীর লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় উন্নতি করতে এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বরিত হতে পর্যন্ত দেখা যায়। ইসলাম বিদ্বেষীরা তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার করেছেন বলে সুলতান মাহমুদের চরিত্রে কলংক লেপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে থাকে। কিন্তু ভুরি ভুরি প্রমাণের মধ্য থেকে একটি মাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যা তাঁর দয়া ও উদারতার স্বাক্ষর বহন করে আর গোলামদের সাথে তাঁর আচরণের চিত্র ফুটে ওঠে।

সুলতান মাহমুদ একবার ভারত আক্রমণ করেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় হিন্দুকে বন্দী করে নিজের সাথে গজনী নিয়ে যান। এদের মধ্যে একজন চালাক-চতুর গোলাম ছিল। তাকে আযাদ করে দিয়ে তিনি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তোলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তাকে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে নিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে তাকে 'ঘোর' প্রদেশের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করা হয়। তদানীন্তন কালে 'ঘোর' ছিল আজকালের স্বায়ত্তশাসিত দেশীয় রাজ্যের সমপর্যায়ের। আড়ম্বরপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠানে তার শিরে রাজমুকুট পরিয়ে দিলে সে রোদন করতে থাকে। সুলতান তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ একি, এটা কি ক্রন্দনের সময় নাকি আনন্দের ? সে আরয করল—জাঁহাপনা! আজকের এই গৌরবময় আনন্দলগ্নে বাল্য জীবনের ঘটনা স্মরণ করে অশ্রু সম্বরণ করতে পারছি না। হুযূর, বাল্য বয়সে হিন্দুস্তান থাকাকালে আপনার অভিযানের খবর শুনে হিন্দুরা ভয়ে কম্পমান থাকত। হিন্দু মায়েরা দৈত্যের ন্যায় আপনার ভয় দেখিয়ে সন্তানদেরকে থামাবার চেষ্টা করত। আমার মা-ও আপনার নাম করে তেমনি জুজুবুড়ির মত ভয় দেখাতেন। আমি মনে করতাম মাহমুদ না জানি কত বড় জালিম, অত্যাচারী। এক পর্যায়ে আমার দেশের উপর আপনি আক্রমণ পরিচালনা করেন। আপনার বিপক্ষে হিন্দু প্রতিরক্ষাকারী দলে এ গোলামও যুদ্ধরত ছিল। তখন পর্যন্ত আমি নিজেও আপনার নামে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম।

অতঃপর আপনার হাতে বন্দী হলে আমার ভয়ের অবধি ছিল না—"আর বুঝি রক্ষা নেই।" কিন্তু শত্রুপক্ষের ঐতিহ্যের বিপরীত আমার প্রতি আপনার উদার আচরণের ফলে আমার শির আজ রাজমুকুটে সুশোভিত। অতীতের সে স্মৃতি স্মরণ করে করে আজকে আমার চোখে অশ্রু গড়িয়ে যাচ্ছে। হায়......আজ যদি আমার মা উপস্থিত থাকতেন! তাকে বলতাম—দেখ ; এই সেই মাহমুদ যাকে তুমি দৈত্যজ্ঞান করতে।

বন্ধুগণ, এজাতীয় ঘটনায় ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ। আর এগুলি ইসলামের উদারনীতিরই সুফল বলা যায়। পক্ষান্তরে এদেরকে যদি কারাগারে নিক্ষেপ করা হতো তাহলে মুসলিম সমাজের সাথে হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার কোন অবকাশই থাকত না। কিন্তু গোলামির সুবাদে এরা মুসলিম সমাজের সাথে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পায়, শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি করে নিজ নিজ মেধানুযায়ী প্রত্যেকেই মর্যাদার উচ্চ শিখরে আসীন হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাই তাদের মধ্য থেকে কেউ মুহাদ্দিস, কেউ ফকীহ, মুফাস্সির, কারী, বিচারক, হাকীম, পণ্ডিত, আবার কেউবা সাহিত্যিকরূপে খ্যাতির অত্যুচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। গোলামদের সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর বাণী হচ্ছে—নিজেরা যা খাবে, পরবে গোলামদেরকেও তাই খেতে-পরতে দেবে। খাদ্য তৈরী করে দিলে তাদেরকে নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়াবে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর অন্তিমকালীন বাণী প্রণিধানযোগ্য—

اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

—নামায ও অধীনস্থ গোলামদের সম্পর্কে তোমরা যত্নবান থেকো। এর চেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা ও রেয়াত আর কি হতে পারে ?

আল্ হাম্‌দুলিল্লাহ্, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং অধিকাংশ মুসলিম সম্রাট গোলামদের সাথে অনুরূপ আচরণ ও নীতি অবলম্বন করেছেন। অবশ্য দু'-একজন এর ব্যতিক্রম করে থাকলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর জন্য ইসলাম দায়ী নয়।

প্রশ্ন ঃ ৮. ইসলামী তা'যীর বা সাজা অত্যন্ত কঠোর যা বর্বরতার শামিল।

উত্তর ঃ বর্তমানের উন্নত জাতিগুলো তরবারির দ্বারা কিসাসের পরিবর্তে ফাঁসির প্রথা প্রবর্তন করেছে। এটাও এক মর্মান্তিক ব্যবস্থা। কেননা এতে প্রাণ বের হওয়ার কোন পথ থাকে না যা কতলের মধ্যে লক্ষ করা যায়। ফাঁসিতে ঝুলন্ত ব্যক্তির চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, এমনকি যন্ত্রণাকাতর ও ছটফটানিতে তার জিহ্বা পর্যন্ত বের হয়ে আসে। এর চেয়েও উন্নত জাতিসমূহ একই উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক চেয়ার আবিষ্কার

করেছে যাতে বসা মাত্রই সেকেন্ডের মধ্যে অপরাধীর প্রাণ বের হয়ে যায়। এতে প্রাণের উপর কি পরিমাণ আঘাত পড়ে এবং যাতনার মাত্রা কত অধিক ও তীব্র হয় তা কল্পনারও অতীত। তার কষ্ট যেহেতু দর্শকদের নজরে আসে না, কাজেই মনে করা হয় তার বুঝি কোন কষ্টই হয়নি, সে আরামেই মরেছে। পক্ষান্তরে হত্যার দৃশ্য, লাশের গড়াগড়ি এবং রক্তের স্রোত দর্শকের দৃষ্টিগোচরে আসার ফলে এটাকে বর্বর শাস্তি মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। তবে হ্যাঁ, সুবিধা এই হয়েছে যে, নিজের চোখে সে বিভীষিকাময় দৃশ্য তাদেরকে আর দেখতে হলো না। তারা তাই ধারণা করে নিয়েছে যে, সে ভয়ানক দৃশ্য যখন আমাদের সামনে অনুপস্থিত, কাজেই বাস্তবে কোন কষ্টই বোধ হয় তার হয়নি। এটা অদৃশ্যকে দৃশ্যের সাথে তুলনার নামান্তর। এ নীতির বলেই তারা সকল অদৃশ্য বস্তুকে অস্বীকার করে বলে থাকে যে, যা কিছু দৃশ্যমান নয় তার অস্তিত্ব অস্বীকারযোগ্য। দৃষ্টিগোচর না হওয়াকে তারা বস্তুর অস্তিত্বহীনতার দলীল বলে ধারণা করে নিয়েছে। অথচ আমেরিকা আবিষ্কার হলো মাত্র কিছুদিন পূর্বে, তাই বলে কি পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না? বাস্তবে এটা ভিত্তিহীন কথা, অযৌক্তিক দাবি। কাজেই এ প্রশ্নও অবান্তর যে, বেহেশত-দোযখ বলে যদি কোন কিছুর অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে তা দৃষ্টিগোচর হয় না কেন ? উত্তর একেবারে পরিষ্কার—বস্তুর অস্তিত্বের জন্য দৃশ্যমান হওয়া জরুরী নয়। সুতরাং ফাঁসিকাষ্ঠে কিংবা বৈদ্যুতিক চেয়ারে প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির যন্ত্রণাকাতর দৃশ্য কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি বলেই তার কষ্ট কম হয়েছে এ যুক্তি অসার—অর্থহীন। পক্ষান্তরে বর্তমানকালের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রাণ সংহারের তুলনায় হত্যা করাতে কষ্ট কম হওয়াটাই বরং অধিকতর যুক্তিসংগত। কারণ, দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার নামই মরণ। তাই যে ব্যবস্থায় প্রাণ বের হয়ে আসার পথ রাখা হয় আর সহজে বের হয়ে আসতে পারে অবশ্যই তাতে দেহের যাতনা অপেক্ষাকৃত কম হতে বাধ্য। আর যে পন্থায় শ্বাসরুদ্ধ করে প্রবল চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণ বের করা হয় তাতে যন্ত্রণা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও তাতে সময়ের ব্যবধান কম হয়। এর দ্বারাই শরীয়তের উচ্চতর মূল্যমান প্রমাণিত হয় যে, নির্ধারিত নীতিতে অপরাধীর সাথেও সদয় ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তলোয়ারের আঘাতে কিসাসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে—এতে যে দর্শকের মনে ভীতির উদ্রেক করে ? উত্তরে বলতে চাই—কিসাস বা অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার মূল দর্শন এতেই নিহিত। সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে জনমনে ভীতির সঞ্চার হবে আর তারা হত্যাযোগ্য অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে উন্নত জাতিসমূহের প্রবর্তিত

পন্থায় দর্শক ও জনমনে ভয়-ভীতির সঞ্চার না হওয়ার ফলে এ শাস্তি শিক্ষামূলক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না। অবশ্য এই লাভ হয় যে, নির্দয়ভাবে অপরাধীর যন্ত্রণা সহস্রগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ কারো প্রাণ যখন সংহার করতেই হবে, তখন তাকে একটু শান্তিতে মরতে দেয়াই সঙ্গত ছিল। এ পর্যায়ে মহানবী (সা)-এর বাণী হচ্ছে ঃ

اذا قتلتم فاحسنوا القتل وان اذبحتم فاحسنوا الذبح

—যখন তোমরা হত্যা করবে, উত্তম পন্থায় তা কর আর যবাই করলেও উত্তমরূপে যবাই কর।

হাদীসের মর্মার্থ কেবল কিসাসের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, বরং কোন কাফেরকে হত্যা করা এবং পশু যবাই করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং নির্দয়ভাবে হত্যা করতে নিষেধ করে শরীয়ত জালেম, কাফের, এমনকি প্রাণীকুলের প্রতি পর্যন্ত দয়া ও মানবতাবোধের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। অপরদিকে কিসাসের দ্বারা কেবল অপরাধীই নয়, বরং অন্যদেরও কল্যাণ সাধন করা হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ্‌র বাণী হচ্ছে ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

—কিসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, হে বিবেকবানেরা! যেন তোমরা খোদাভীতি অবলম্বন কর।

এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কিসাসের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক ও শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে। —এফনাউল মাহবুব, পৃষ্ঠা ৪

প্রশ্ন ঃ ৯. বেহেশ্‌ত-দোযখ কেবল মুসলমানদের সান্ত্বনাবাণী, মূলত এগুলো অস্তিত্বহীন।

উত্তর ঃ কারো কারো ধারণা, বেহেশ্‌-দোযখের বুলি কেবল ভীতি এবং উৎসাহ-ব্যঞ্জক কথা, এগুলোর কোন অস্তিত্ব নাই। (নাউযুবিল্লাহ্) বস্তুত তারা এটাই বোঝাতে চায় যে, কুরআনে উল্লিখিত চুরি-ডাকাতি, জুলুম-অত্যাচার, যিনা, ব্যভিচার, কুফরি ও পাপাচার সম্পর্কে সকল ভয়-ভীতি কেবল ছেলে ভোলানো জুজুবুড়ির ভীতি প্রদর্শনের নামান্তর যে, চুপ কর—দৈত্য-দানব এসে যাবে। তদ্রূপ সকল নিয়ামত ও সুখ-শান্তির বর্ণনা কেবল ছেলেদেরকে প্রবোধ ও উৎসাহ দানের শামিল; আসলে এ সবই অস্তিত্বহীন অলীক কল্পনামাত্র। তাদের জবাবে আমি বলতে চাই—একজন সাধারণ বিচারকের পক্ষেও যেক্ষেত্রে এ ধরনের কাল্পনিক কথা ও অতিশয়োক্তি দূষণীয় ব্যাপার, সেক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কালামের তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, আলোচ্য প্রশ্নের

সারমর্ম নির্জলা মিথ্যা প্রবঞ্চনামূলক কথা, মহান আল্লাহ্ যা থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র। সুতরাং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذَالِكَ عُلُوًّا كَبِيراً - وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا -

(অর্থাৎ, মহান আল্লাহ্ এসবের ঊর্ধ্বে, মহান ও শ্রেষ্ঠ। এবং আল্লাহ্‌র চেয়ে সত্যবাদী আর কে হতে পারে ?) তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করেও নেয়া হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম শুধু ভীতি ও উৎসাহব্যঞ্জক রূপকথারই অভিব্যক্তি, বাস্তবে এগুলি অস্তিত্বহীন, তাহলে বলাই বাহুল্য যে, ভয়-ভীতি এবং উৎসাহমূলক কথাবার্তা ততক্ষণই চলতে পারে যতক্ষণ ব্যক্তির নিকট এর মূলতত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে। কেননা রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর তাতে আর ভয় ও উৎসাহ বলতে আদৌ কিছু থাকে না। অতঃপর "জান্নাত-দোযখ নেই" তাদের এ দাবি মূলত অসার ও ভিত্তিহীন। কেননা বেহেশ্‌ত ও দোযখের অস্বীকৃতি দ্বারা কালামে ইলাহীর আবেদন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়। (আল্লাহ্ রক্ষা করুন) কুরআন সম্পর্কে কারো পক্ষেই এ ধরনের উক্তি করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্‌র অনুগত করার মহান উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যায়। তদুপরি এ ধরনের আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি নির্ভয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। লজ্জার খাতিরে জনসমক্ষে না হলেও গোপনে পাপকাজে লিপ্ত হলে তাকে কে বাধা দেবে ? একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যাক। যেমন মনে করুন, জান্নাত-জাহান্নামে অবিশ্বাসী, খোদার ভয়-ভীতিহীন কোন ব্যক্তি বনে বাস করে। সেখানে তার এক সঙ্গী ব্যতীত পুলিশ-চৌকিদার বলতে দ্বিতীয় কেউ নাই। এখন মনে করুন ঘটনাচক্রে তার সঙ্গীটি যদি নগদ এক লাখ টাকা রেখে মারা যায়, কাগজে তার পূর্ণ ঠিকানা, পরিবারের পরিচয় ইত্যাদি লেখা রয়েছে আর সে এটাও জানতে পারল যে, বাড়িতে তার ওয়ারিস হিসাবে এক ইয়াতীম পুত্র রয়েছে, এখন তার কাছে এসব থাকা সত্ত্বেও কেউ জানতে পারল না তার সঙ্গীটি কোথায় কিভাবে মারা গেল এবং মৃত্যুকালে মালামাল কি রেখে গেল। ফলে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তার কাছে দাবিও করা যাবে না বা মোকদ্দমাও দায়ের করা সম্ভব নয়।

সুতরাং এখন বলুন, একমাত্র আল্লাহ্ ও আখেরাতের আযাবের ভয়-ভীতি ছাড়া ইয়াতীমের হাতে তার পৈতৃক সম্পদ ফিরিয়ে দিতে তাকে কে বাধ্য করবে ? আর সে কি স্বেচ্ছায় ওয়ারিসের নিকট সে টাকা পৌঁছে দেবে ? অথচ তার অর্থের প্রয়োজনও রয়েছে এবং নিজেও সে অভাবী। এটা একমাত্র সে ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যে আল্লাহ্‌র ওয়াদা এবং ভীতি প্রদর্শনকে সত্য মনে করে, পরকালে আযাবের ভয় রাখে। এ

জাতীয় বিশ্বাসের দ্বারা শরীয়ত কিংবা সামাজিক উভয় কল্যাণ ব্যর্থ হয়ে যায়। এর দ্বারাই বোঝা যায় সভ্যতার স্বার্থে—মানবতার কল্যাণে ইসলামের প্রয়োজন যে কত তীব্র, কত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের আনুগত্য ও অনুশীলন ব্যতীত রাষ্ট্রের একক প্রচেষ্টায় সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ অবাস্তব, কল্পনা-বিলাস মাত্র। কেননা রাষ্ট্রের আইনগত চাপ কেবল প্রকাশ্য বিষয়ের মধ্যেই সীমিত। নৈতিক চরিত্র একমাত্র ধর্মের প্রভাবেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, সভ্যতার দাবিদাররা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এত অজ্ঞতার শিকার কেন ? অথচ যাবতীয় মানবিক চাহিদার মধ্যে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মৌলিক ও সর্বাগ্রে। ধর্মকে অস্বীকার করে বা পাশ কাটিয়ে কোন সভ্যতার পক্ষেই বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব নয়। সভ্যতার দাবি উচ্চারণের পর ধর্মকে এড়িয়ে যাওয়া কবির ভাষায় যেমন ঃ

یکے بر سرے شاخ وبں می برید
خداوند بستان نگہ کرد ودید

—"এক ব্যক্তি শাখায় বসে গাছের শিকড় কাটছে আর বাগানের মালিক তা প্রত্যক্ষ করছে"-এর নামান্তর।

মোটকথা এরা সভ্যতার শাখায় বসে তারই শিকড় উপড়ে ফেলছে। বিস্ময়ের ব্যাপার! এরা মুখে তো সভ্যতার বুলি আওড়ায় কিন্তু কাজের বেলায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস স্থাপন করা যে ধর্মীয় ও দীনি বিশ্বাসেরই অঙ্গ এবং দীনি বিষয় এটা আপনাদের বোধগম্য না হওয়ার কথা নয়। —শা'বুল ঈমান, পৃ. ১০৮

প্রশ্ন ঃ ১০. মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে ?

উত্তর ঃ কোন অমুসলমানের হয়তো সন্দেহ হতে পারে যে, মুসলমানদের নিকট মহানবী (সা) আল্লাহ্র সমকক্ষ। এ সম্পর্কে তাদের জানা উচিত যে, ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্র কোন শরীক বা অংশীদার আছে বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবিতকালে তাঁকে সিজদা করা জায়েয ছিল না। কিন্তু আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য খোদার আনুগত্যেরই নামান্তর। এটা ইবাদতের মধ্যে তাঁর শরীক হওয়ার কারণে নয় বরং এ জন্য যে, তিনি যা কিছু বলেন সবই আল্লাহ্র হুকুমে বলে থাকেন। পয়গাম্বরের মর্যাদায় আসীন থাকার কারণে তাঁর আদেশ-নিষেধ মূলত আল্লাহ্রই আদেশ-নিষেধ। তাই বলা হয় তাঁর হুকুম পালনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই হুকুমের আনুগত্য করা হয়। কুরআনের ভাষায় ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ·

—যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল মূলত সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল এবং

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ·

—যে ব্যক্তি আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করল, সে যেন আল্লাহ্রই হাতে বায়'আত করল।

এর দৃষ্টান্ত এরূপ কোনও বাদশাহ্ যেন উযীরকে নির্দেশ দিলেন—"প্রজাদের মধ্যে এ বিধান জারি করে দাও।" সুতরাং মন্ত্রীর মাধ্যমে যে বিধানটি এখন প্রচারিত হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেটা বাদশাহ্রই নির্দেশ। কাজেই মন্ত্রীর নির্দেশ পালন করা মূলত বাদশাহ্র হুকুমেরই আনুগত্যরূপে গণ্য। কিন্তু কখনো কেউ এরূপ মনে করে না যে, মন্ত্রী ও বাদশাহ্ একই পর্যায়ভুক্ত। কোন নির্বোধ এরূপ মনে করে রাজসিংহাসনের স্থলে যদি মন্ত্রীর আসন চুম্বন করতে শুরু করে, তবে নিশ্চয়ই সে একটা ধিক্কৃত ও ঘৃণিত ব্যক্তি। তদ্রূপ মোকদ্দমা পরিচালনার উদ্দেশ্যে আপনার নিযুক্ত উকীলের মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কথাবার্তা, যুক্তিতর্ক, কার্যকলাপ আপনার সাথেই সম্পৃক্ত করা হয় যেন আপনি নিজেই বক্তব্য পেশ করছেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, উকীল সমকক্ষ হিসেবে আপনার বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়ে যথেচ্ছ ভোগ দখলের অধিকার লাভ করবে। সুতরাং উকীলের ভাষণ যেমন মুয়াক্কেলেরই বক্তব্য; আর মন্ত্রীর আনুগত্য বাদশাহ্রই আনুগত্য, সে অর্থেই মুসলমানগণও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যকে আল্লাহ্র আনুগত্যরূপে বিশ্বাস করে থাকে। এর দ্বারা সমকক্ষতা কিংবা অংশীদারিত্ব যে আদৌ প্রমাণিত হয় না, তা উত্তম রূপে অনুধাবন করা উচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন উত্থাপনের সময় ইসলামী বিধানের গূঢ় রহস্য হয় বোঝেই না, না হয় এসব কথা তারা বিদ্বিষ্ট মন নিয়ে বলে থাকে। অন্যথায় ইসলামী বিধান ও নীতিমালার বিপক্ষে কোন আপত্তি উঠতেই পারে না। — মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ২০

১১. প্রতিষ্ঠালাভই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইসলাম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য।

উত্তর ঃ ইসলাম প্রচার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল না, এটা চরম সত্য ও নিশ্চিত কথা। কেননা উচ্চাভিলাষী ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি সাধারণত মানুষকে তার সামনে নত করতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু মহানবী (সা)-এর অবস্থা ছিল এই যে, লোকে তাঁকে সিজদা করতে চাইত, কিন্তু তিনি তাদেরকে এ কাজ করতে শুধু নিষেধই করতেন না বরং নিজেকে তিনি ক্ষণস্থায়ী জীবনের অধিকারী

বলে অকপটে প্রকাশও করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনৈক মূর্খ কাফির প্রশ্ন তুলেছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আত্মমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এর স্বপক্ষে তার প্রমাণ হলো—মহানবী (সা) হজ্জের সময় স্বীয় কেশমুবারক জনৈক সাহাবীর হাতে প্রদান করত বলেছিলেন, "এগুলো মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।" অতঃপর সে মূর্খ আরো লিখেছে যে, বরকত মনে করে তাযীমার্থে সংরক্ষণের জন্যই তিনি তাঁদের মধ্যে এগুলো বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাজেই প্রমাণ হয় যে, তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের অভিলাষী ছিলেন। (আস্তাগফিরুল্লাহ্!) এই হলো আধুনিক বিবেক-বুদ্ধির পরিচয়। পরিতাপের বিষয়, প্রশ্নকারীর ইবাদত ও মহব্বতের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞানটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাস্তবিকই কাফিরদের অন্তরে প্রেম-প্রীতির প্রতি কোন আকর্ষণই পরিলক্ষিত হয় না।

এ কারণেই তারা ঘটনার মর্ম উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ইচ্ছা হয় এদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে বলে দেই ঃ

با مدعی مگوید اسرار عشق ومستی
بگذار تابمیرد در رنج خود پرستی

—মিথ্যা-ভণ্ডের সামনে প্রেমের মর্মকথা ব্যক্ত করবে না। ছেড়ে দাও আত্মম্ভরিতার যাতনায় সে মরে যাক।

কিন্তু সান্ত্বনার ছলে জবাব দিচ্ছি, যেন কোন মুসলমানের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলে এ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হলো—হুযূর (সা) এমন সব লোকের মধ্যেই পবিত্র কেশমুবারক বণ্টন করেছিলেন, যারা ছিলেন নবীপ্রেমে আত্মহারা। যাদের সামনে তাঁর ওযূর একবিন্দু পানিও মাটিতে পড়া সম্ভব ছিল না। তাঁর মুখের থুথু ও ওযূর পানি সংগ্রহ করে চোখে-মুখে মাখার জন্য যাঁরা উন্মাদের ন্যায় ছুটে যেতেন। তাঁর ওযূর পানি ও থুথু স্বহস্তে সর্বাগ্রে ধারণ করার জন্য সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং ছোটাছুটির ফলে একে অপরের গায়ের উপর পড়ে যেতেন। তাঁদের নিখাদ প্রেমের এমনি অবস্থা ছিল যে, একবার নবী করীম (সা) সিংগা লাগানোর ফলে নির্গত রক্ত কোথাও সযত্নে পুঁতে ফেলার জন্য জনৈক সাহাবীর হাতে দিলেন। কিন্তু মহানবী (সা)-এর রক্ত মাটিতে দাফন করে দেয়াটাই ছিল নবী-প্রেমে মত্ত সাহাবীর পক্ষে অকল্পনীয়-অসহনীয় ব্যাপার। তাই নির্জনে গিয়ে তিনি তা পান করে ফেললেন। এ ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, (নাউযুবিল্লাহ্) উক্ত সাহাবী এতই আত্মহারা, নোংরা ছিলেন যে, থুথু গায়ে মর্দন করতে এবং রক্তপানে নিজের মনে ঘৃণাবোধ পর্যন্ত জন্মে

নাই। আসল কথা হলো—এখানে ছিল মূলত প্রেমের সম্পর্ক যার মর্ম কেবল প্রেমিকের পক্ষেই উদ্ধার করা সম্ভব। যাদের অবস্থা হলো ঃ

غیرت آن چشم برم روئے تو دیدن ند هم
گوش رانیز حدیث تو شنیدن ند هم

—প্রেয়সী গো, আমার নয়ন যুগল তোমার রূপের ছটায় দৃষ্টি ফেললে এবং কর্ণকুহরে তোমার আওয়াজ পৌঁছলে আত্ম-মর্যাদায় আঘাত পড়ে। অর্থাৎ আমার আত্ম-মর্যাদা এতই প্রবল যে, নিজের চোখ-কানকে পর্যন্ত প্রেয়সীর রূপের পানে তাকাতে, তার প্রেমালাপ শোনার অনুমতি দিতে নারাজ।

বন্ধুগণ! কারো সাথে যদি আপনাদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে থাকে তবে ব্যাপারটা বুঝে আসবে। প্রেমিক তো কখনো প্রেমাস্পদের জিহ্বা নিজের মুখে পুরে চুষতে থাকে। আর প্রেমিক কবিরা তো প্রেয়সীর মুখের লালার প্রশংসায় একের পর এক কাব্যগাঁথা রচনা করে ফেলে। তা'হলে তারা কি নির্বোধ ? মোটেই না। তারা যদি তাই হয় তবে বুঝতে হবে পুরো জগতটা বোকার আড্ডাখানা। কেননা প্রেমের উন্মাদনায় সবাই এমনটি করে থাকে, কোন প্রেমিকই এর ব্যতিক্রম নয়। তদ্রূপ প্রেয়সীর রক্ত ঝরা প্রেমিকের নজরে পড়লে বেদনা লাঘব করার উদ্দেশ্যে সে ক্ষত স্থান চুষতে আরম্ভ করে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, রক্ত চোষাও কোন ঘৃণার বিষয় নয়। এতে সে কি যে আনন্দ পায় তা তার প্রেমসিক্ত মনকে জিজ্ঞেস করা উচিত। কাজেই সাধারণ তুচ্ছ প্রেমাস্পদের থুথু ও রক্ত চোষা যদি ঘৃণার বিষয় না হয়, সে ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর থুথু, ঘাম ও রক্ত ঘৃণিত হওয়ার কি যুক্তি আছে। কেননা জন্মগতভাবেই তাঁর সারাদেহ সুগন্ধিময় ছিল। তাঁর দেহ বিগলিত ঘাম এবং মুখের থুথু মোবারক আতরের চেয়েও অধিক সুগন্ধ ছিল। রক্তেরও ছিল একই অবস্থা। এমন বস্তুকে কে ঘৃণা করতে পারে! কিন্তু বিধর্মী কাফেররা এসব বিষয় অবহিত নয়। তাঁর সাথে আন্তরিক মহব্বত কিংবা তাঁর অবস্থা সম্পর্কে তারা আদৌ জ্ঞাত নয়। মোটকথা সাহাবীগণ ছিলেন নবীর প্রেমে মত্তপ্রায়। তাঁর ওযূর পানি হাতে হাতে নেয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে থাকত। তাই এমন লোকদের থেকে এটা আশা করা যায় না যে, তারা তাঁর কেশ মোবারক মাটির নিচে দাফন করে দেবেন। এটা নিশ্চিত যে, ওযূর পানির তুলনায় কেশ মোবারকের মর্তবা অধিক ছিল। কেননা পানি তো কেবল এক মুহূর্ত নবীর দেহ মোবারক স্পর্শ করেছে পক্ষান্তরে কেশ মোবারক দেহের অঙ্গস্বরূপ। বলা বাহুল্য, কেশ মোবারক তিনি দাফন করিয়ে দিলেও সাহাবীগণ মাটি খুঁড়ে তা আরো অধিক পরিমাণে সংগ্রহের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা

শুরু করে দিতেন। এমনকি মারামারি-হানাহানি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। কাজেই তাঁদেরকে কলহ-বিবাদ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্ণেই তিনি তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, যাতে সমস্যা এখানেই চুকে যায়। এতে আপত্তির কি থাকতে পারে বলুন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম (সা) কর্তৃক স্বীয় কেশ মোবারক বণ্টন করাটা আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিল না বরং সাহাবীগণের নিখাদ আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ করে এবং তাঁদের পারস্পরিক কলহকে কেন্দ্র করেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ না করুন—তাঁর অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকারবোধ থাকলেও তিনি মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করতেন, জমকালো অট্টালিকা তৈরি করতেন, উত্তম ও সুখাদ্য আহার করতেন, অধিকন্তু সম্পদের পাহাড় তাঁর করায়ত্তে এসে যেত। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর (সা)-এর পোশাক ছিল মোটা বস্ত্র, কাঁচা ঘর ছিল তাঁর বাসস্থান। সম্পদ বলতে তাঁর হাতে কিছুই সঞ্চিত থাকত না। তাঁর অর্থ এ নয় যে, সম্পদ তাঁর হাতে জমাই হতো না, বরং কোন কোন যুদ্ধের পর অঢেল সম্পদ তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ত। যুদ্ধলব্ধ গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত তার অংশের বকরীতে ময়দান ছেয়ে গিয়েছিল। এগুলো তিনি কাউকে এক শ, কাউকে দু'শ করে বণ্টন করে দিতেন। বাহরাইন থেকে আদায়কৃত জিযিয়া করের স্বর্ণমুদ্রা মসজিদে স্তূপীকৃত হয়ে গিয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তা সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। অথচ নিজের জন্য এক কপর্দকও রাখেন নি। আত্মগর্বী লোকের বেলায় এটা কি কল্পনা করা যায় যে, নিজে শূন্য হয়ে অপরকে সে বিত্তশালী বানিয়ে দেবে ? অপরদিকে তার বিনয়-নম্র স্বভাবের অবস্থা ছিল এই যে, পথ চলাকালে সাহাবীগণকে সামনে দিয়ে তিনি নিজে পিছনে থাকতেন। সময় সময় ঘটনা এমনও হয়েছে যে, মহানবী (সা) পায়ে হেঁটে পথ চলছেন আর সাহাবীগণ যাচ্ছেন সওয়ার হয়ে। তাঁকে দেখে সওয়ারী থেকে নামতে চাইলে তিনি নিষেধ করতেন। নিজ হাতে বাজার-সদাই করা ছিল মহানবী (সা)-এর অধিকাংশ দিনের অভ্যাস । কারো কোন সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলে হাত ধরে প্রয়োজনস্থলে তাঁকে নিয়ে যেতে পারত আর তিনিও খুশি মনে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন। বাড়িতে বকরী দোহন করা, নিজ হাতে জুতা সেলাই করে নেয়া, আটা ছানা ইত্যাদি সাংসারিক কাজ-কাম তিনি আপন হাতে সমাধা করে নিতেন। কখনো মাটিতে আসন করে বসে যেতেন, চাটাইতে শয়ন করার ফলে তাঁর নূরানী দেহে চাটাইর চিহ্ন ফুটে উঠত। একবার জনৈক ইহুদী পাওনা টাকার জন্য তাঁর সাথে রুক্ষ ব্যবহার করার কারণে ক্রোধান্বিত সাহাবীগণ সে ইহুদীকে ধমকাতে চাইলে তিনি এই বলে তাঁদেরকে বারণ করেন ঃ "ছেড়ে দাও, পাওনাদারের বলার অধিকার রয়েছে।"

এখন সে অজ্ঞ প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করা দরকার শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যাশী এবং আত্মগর্বী লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি এ ধরনের হতে পারে ? পরিতাপের বিষয়! প্রশ্নকারীর চোখে কেবল কেশ বণ্টনের ঘটনাটাই কি ধরা পড়ল আর এসব সত্য থেকে সে অন্ধ হয়ে গেল ?

সুতরাং আমার এ বর্ণনা দ্বারা আশা করি প্রশ্নকর্তার দ্বন্দ্ব কেটে গেছে যে, কেশ বণ্টন আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়; বরং এর আড়ালে শিক্ষা-সভ্যতা, তামদ্দুনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনই একমাত্র কাম্য ছিল। অধিকন্তু কেশ বণ্টনের প্রেক্ষাপটে তিনি এ-ও বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমি এক ক্ষণস্থায়ী জীবন ও নশ্বর দেহের অধিকারী, চিরস্থায়ী অবিনশ্বর জীবন নিয়ে আসিনি। কেননা চুলের অবস্থা পরিবর্তনশীল, কখনো তার অবস্থান দেহের শীর্ষভাগে, আবার কখনো ক্ষুর-কাঁচির আঘাতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভূ-তলে। কাজেই দর্শকমাত্রই তাঁর বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত কেশ মোবারক দেখে বিশ্বাস করবে যে, তিনি সৃষ্ট মানবই ছিলেন, চিরঞ্জীব খোদা নন। (তাই আল্লাহ্র রহমতে আজও কোন কোন স্থানে তাঁর কেশ মোবারক সংরক্ষিত রয়েছে, মানুষ তা দর্শন করে থাকে।) এর দ্বারা নিজের বড়ত্ব নয় বরং তিনি মুসলমানদের ঈমান সুদৃঢ় ও মজবুত হওয়ারই ব্যবস্থা করেছেন বলা যায়। প্রসঙ্গত কবি বলেন ঃ

چون ندید حقیقت ره افسانه روند

—সত্যপথ না পেলে মানুষ ভ্রান্ত পথে ছুটে। — মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ৫৮

প্রশ্ন ঃ ১২. নাজাতের জন্য আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনাই যথেষ্ট, রিসালতের প্রতি বিশ্বাসে প্রয়োজন কি ?

উত্তর ঃ কোনরূপ বে-আদবীপূর্ণ আচরণ না করে মহানবী (সা)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাটাও নবুওয়তের আলো ও বরকত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়ার শক্তিশালী কারণ। এর দ্বারাই সেসব লোকের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়, রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের অপরিহার্যতা অস্বীকার করে যারা কেবল আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস পোষণ করাকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করে। পরিতাপের বিষয়, মুসলমানদের মধ্যেও কতিপয় লোকের ধ্যান-ধারণা সেই একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের মতে নবী করীম (সা) শুধু তাওহীদের বাণী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই আগমন করেছিলেন। কাজেই তাঁর রিসালতের স্বীকৃতি না দেয়া সত্ত্বেও কেবল তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস সাপেক্ষে মানুষ মুক্তি পেয়ে যাবে। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা উচিত যে, এ ধরনের কথা সর্বৈব মিথ্যা ও বাতিল। রিসালতের স্বীকৃতি ছাড়া নাজাতের চিন্তা করাটা অলীক স্বপ্ন মাত্র। তাওহীদ যেমন ঈমানের অংগ তদ্রূপ শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন

করাও একই পর্যায়ের। কুরআন পাকের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ -

—"ঈমানদার, ইহুদী, নাসারা ও সাবিয়ীনদের (তারকাপূজারী) মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।"

উক্ত আয়াতে রিসালাতে বিশ্বাসের অপরিহার্যতার কথা দৃশ্যত উল্লেখ নেই বরং আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসকেই সব সম্প্রদায়ের জন্য নাজাতের ভিত্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা কেউ কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে যে, নাজাতের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাতের উপর ঈমান আনা অনিবার্য নয়। কিন্তু মূল কথা হলো, মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের বিশ্বাস ব্যতিরেকে আল্লাহ্ ও আখিরাতের ঈমান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং "বিশেষ একটি আয়াতে বর্ণিত হয়নি বলে রিসালাতের ঈমান নিষ্প্রয়োজন" কথাটা একটা বিভ্রান্তিকর উক্তি। এ প্রসংগে জনৈক ডেপুটি কালেক্টরকে পাঠানো আমার বক্তব্যে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তো তিনি একজন সত্যপরায়ণ লোক ছিলেন, রীতিমত নামায-রোযা করতেন। কিন্তু শয়তানী চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি ভ্রান্তিজালে আটকে যান যে, নাজাতের জন্য 'ঈমান বিল্লাহ্ই যথেষ্ট, রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা জরুরী নয়।" বাস্তবিকই দীনী ইলম ছাড়া পরিপূর্ণ আত্মিক সংশোধন এবং আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত হতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, মানুষ আজকাল ইংরেজি শিক্ষাকেও 'ইলম মনে করে নিয়েছে। অবশ্য এর দ্বারা অর্থ উপার্জনের সুরাহা হয়, কিন্তু আল্লাহ্কে চেনা যায় না। ডেপুটি সাহেবকে আমি জবাবে বলেছি—"আল্লাহ্ মৌজুদ আছেন" কেবল এটুকু মেনে নেয়াতেই "আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের" পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না। কেননা মুশরিকরাও আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। বরং ঈমান বিল্লাহ্র অর্থ হলো, আল্লাহ্কে সিফাতে কামাল তথা যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের নিরংকুশ অধিকারী এবং বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র বলে ঐকান্তিক বিশ্বাস ঘোষণা করা। এখন আমার কথা হলো—সত্যবাদিতাও সিফাতে কামালের (সার্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের) একটা অংশ, আল্লাহ্কে এর নিরংকুশ অধিকারীরূপে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। তদ্রূপ মিথ্যাচার অপূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ যা থেকে আল্লাহ্র পবিত্রতা স্বীকার করা অনিবার্য। এ তো গেল প্রাথমিক ভূমিকা। দ্বিতীয় কথা হলো—কুরআন

করীমে আল্লাহ্ পাক মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল বলে ঘোষণা করেছেন। আর কুরআন শরীফ যে আল্লাহ্র কালাম তা যুক্তিভিত্তিক ও জ্ঞানসিদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কুরআন-প্রদত্ত ঘোষণা সত্য বলে বিশ্বাস করাও ওয়াজিব। অতএব ফল দাঁড়াল এই যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল হিসাবে স্বীকার করবে না সে যেন আল্লাহ্কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। তাহলে আল্লাহ্র প্রতি "বিশ্বাস স্থাপন" করা হলো কিরূপে? সুতরাং প্রমাণ হলো যে, রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা সম্ভবই নয়। অতঃপর তাকে আমি চ্যালেঞ্জ করি যে, আমার এ দাবির জবাবের জন্য আপনাকে দশ বছর সময় দেয়া হলো। কিন্তু তার কাছে আমার এ যুক্তির কোন জবাবই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্র মেহেরবানীতে তার সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায় এবং আমার সাথে সাক্ষাতও করে। বেচারা ভালভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

মোটকথা, উত্তমরূপে শুনে রাখুন, হুযূর (সা)-এর সাথে আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছাড়া পরকালের মুক্তি আদৌ সম্ভব নয়। এ প্রসংগে আরো একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। ঘটনাটা হলো—নিজেকে প্রকাশ্যে মুসলমানরূপে দাবি করত এমন একজন দার্শনিককে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে। অবশ্য স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে একজন মুসলমান সম্পর্কে অযথা কুধারণার সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় তার নাম প্রকাশ করাটা আমি সমীচীন মনে করি না। যাহোক উক্ত ব্যক্তি স্বপ্নে একবার নবী করীম (সা)-এর দর্শন লাভ করে। সে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অমুক ব্যক্তির (দার্শনিকের) পরিণাম কি হয়েছে ? উত্তরে তিনি বললেন, আমার মাধ্যম ছাড়াই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে চেয়েছিল এবং বেহেশতের নিকট পৌঁছেও গিয়েছিল, কিন্তু "হতভাগা সরে যা" বলে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেই। কেননা আমার সাথে সম্পর্ক ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। মোটকথা মহানবী (সা)-ই উম্মতের মুক্তির একমাত্র মাধ্যম। তাঁর সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা ছাড়া কোন ব্যক্তি ফয়েয লাভ এবং কামাল বা পূর্ণতা অর্জন করতে তো পারেই না এমনকি তার ঈমান পর্যন্ত কবূল হওয়ার যোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গেই মনীষী শেখ সাদী ছন্দায়িত করেছেন ঃ

پندار سعدی که راه صفا
توان رفت جزبر پئے مصطفے
خلاف پیمبر کسے ره گزید
که هر گز بمنزل نخواهد رسید

—শোন হে সা'দী! নবী মোস্তফা (সা)-এর পথ ধরে চলা ছাড়া সরল পথে কে চলতে পারে ? পয়গাম্বরের বিপরীত পন্থা অবলম্বনকারী কখনো গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

এ উক্তি সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা মহানবী (সা)-এর সাথে সম্পর্ক ছাড়াই পথ অতিক্রম করতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে তাঁর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীদের অবস্থা হলো—কবির ভাষায় ঃ

نماند بعصیان کسے در گره
که دارد چنین سید پیش رو

—তিনি যার নেতা সে সমাজের মধ্যে কোন পাপাচারী অপরাধীরূপে থাকতে পারে না।

এবং অপর কবির কথায় ঃ

لوبی لنا معشر الاسلام ان لنا
من العناية ركنا غير منهدم

—হে মুসলিম সমাজ! আমাদের জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমরা এমন আশ্রয়-স্তম্ভ লাভ করেছি যা কখনো বিনষ্ট হবার নয়।

— আর্‌রফা-ওয়াল-ওয়াফা, পৃ. ২৯

প্রশ্ন ঃ ১৩. মহানবী (সা)-এর মি'রাজ শারীরিক ছিল না। কেননা ঊর্ধ্বারোহণ কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

উত্তর ঃ যারা হুযূর (সা)-এর সশরীরে মি'রাজ অস্বীকার করে এবং তা স্বপ্নগত ও আধ্যাত্মিক বলে বর্ণনা করে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। তাদের এ দাবি প্রমাণহীন উক্তি বৈ নয়। কেননা তাঁর মি'রাজ বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমন করার কথা তো কুরআনের আয়াতে স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে, বিনা তাবীলে তথা ব্যাখ্যা ছাড়া যাকে অস্বীকার করা কুফরী। আর তাবীলের ভিত্তিতে অস্বীকার করা বিদআ'ত। মহানবী (সা)-এর শারীরিক মি'রাজ অস্বীকার-কারীদের সপক্ষে আক্‌লী ও নক্‌লী (যুক্তি ও কুরআন হাদীসভিত্তিক) দু-ধরনের দলীল পেশ করা হলো। প্রথমত তাদের যুক্তি হলো—হুযূর (সা)-এর শারীরিক মি'রাজের বাস্তবতা স্বীকার করে নিলে প্রশ্ন দাঁড়ায়—এর ফলে আকাশে ফাটল সৃষ্টি হওয়া এবং পরে সেখানে জোড়া লাগা-প্রক্রিয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। যার কোন বাস্তবতা নেই। এর জবাব হলো—আকাশের ফাটল ও সংযোজনের ওপর দার্শনিকগণের পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব নয়। যদি কখনো তারা নিজেদের এ মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হন তখন ইন্‌শা-আল্লাহ্ একে অসার প্রতিপন্ন করে দেখিয়ে দেব। আর কালামশাস্ত্রবিদ আলিমগণ যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত দলীল-প্রমাণ দ্বারা তাদের এসব

প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ হলো—মি'রাজ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, রাত ভোর হওয়ার পূর্বেই নবী করীম (সা) ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ শেষে ঘরে ফিরে আসেন। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এহেন ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব কথা। কেননা একই রাতে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সপ্ত আকাশ ভ্রমণ করাটা মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বের বিষয়। জবাবে আমি বলব—ব্যাপারটা কঠিন বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। কেননা বিজ্ঞানের মতে 'সময়' হলো গ্রহের চলমান গতি। দিন-রাতের পরিবর্তন, সূর্যের উদয়-অস্ত এসব গ্রহের সে গতির সাথেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই কোন কারণে এর গতি বন্ধ হয়ে গেলে 'সময়' তার স্বস্থানে স্থির, অচল দাঁড়িয়ে থাকবে। রাতে বন্ধ হলে রাত, দিনে হলে দিনই থাকবে। সম্ভবত সে রাতে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের গতি তখনকার মত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে অবাক হবারও কিছু নেই। অতিথির সম্মানার্থে এ ধরনের রীতি বেশ চালু আছে। রাজা-বাদশাদের গমনকালে রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। হায়দ্রাবাদে একবার পুলিশকে রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ করে দিতে দেখলাম। রাস্তা-ঘাট মুহূর্তে জনশূন্য হয়ে পড়ল। ব্যাপার কি ? জানা গেল—নবাবের সওয়ারী আসছে। তদ্রূপ মহানবী (সা)-এর সম্মানার্থে মহান আল্লাহ্ চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও আকাশের গতি সাময়িকভাবে হয়ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যার ফলে সবাই এরা স্ব-স্ব স্থানে থেমে যায়। কাজেই আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। হুযূর (সা) মি'রাজ থেকে অবসর হবার পর আকাশের গতিকে পুনরায় সচল হবার অনুমতি দেয়া হয়। তাহলে এটা পরিষ্কার হলো যে, বন্ধ যেখান থেকে হয়েছিল সেখান থেকেই পুনরায় যাত্রা শুরু হবে। এমতাবস্থায় তাঁর মি'রাজে সময় যা-ই লাগুক মর্ত্যবাসীদের হিসেবে একরাতেই সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে। কেননা সময়ের গতি তো তখন বন্ধই ছিল। এখন "গ্রহের গতি ব্যাহত বা রহিত হয় নাই"—কেউ দাবি করলে সে তার প্রমাণ পেশ করুক। ইন্‌শাআল্লাহ্ এর উপর কোন দলীলই সে উপস্থিত করতে পারবে না। এ প্রশ্নের উত্তরে মওলানা নিযামীর প্রেমিকসুলভ জবাব প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

تن او که صافی تراز علت - اگر امد وشد بیك دم رواست

—হুযূর (সা)-এর দেহ মোবারক আমাদের কল্পনার চেয়েও সূক্ষ্ম ও পবিত্র। কাজেই তিনি মুহূর্তে নভোমণ্ডল ও আরশ পর্যন্ত ঘুরে আসেন তাতে আশ্চর্যের কি আছে।

এটা সবার জানা কথা যে, মানুষের কল্পনা-শক্তি মুহূর্তে শত-সহস্র কোটি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম। সুতরাং আপনি আরশের কল্পনা করুন—দেখবেন

সেকেন্ডেরও কম সময়ে তথায় সে হাযির। কল্পনার গতি অতি দ্রুতগামী। কেননা কল্পনা রূহের শক্তি বিশেষ। আর রূহ্ বস্তুর মতো স্থূলাকার নয় ; বরং অতি সূক্ষ্ম জিনিস। ফলে এর গতি পথে কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না। কাজেই মওলানা নিযামী বলেন ঃ হুযূর (সা)-এর দেহ মোবারক আমাদের কল্পনার চেয়েও সূক্ষ্মতর। সেটাই যখন মুহূর্তে অসীম দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম, সেক্ষেত্রে তিনি মুহূর্তকালে মর্ত্যলোক থেকে উর্ধ্বাকাশে—সেখান থেকে আরশ পর্যন্ত ভ্রমণ করে আসেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দার্শনিকগণ আরেকটি যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত করে থাকেন যে, বায়ুমণ্ডলের উপরের দিগন্তবিস্তৃত শূন্যলোক বায়ুহীন হবার দরুন কোন প্রাণীর পক্ষে সেখানে জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই সে স্তর অতিক্রম করতে হলে তাঁর জীবন রক্ষার কি উপায় ? বেশ, যুক্তি যথার্থ কিন্তু তারা হয়ত ভাবেন নি যে, এ যুক্তি টিকবে তখন যদি সেখানে প্রাণীর অবস্থান বা স্থিতির কোন অবকাশ থাকে। কেননা আগুনের ভিতর অতি দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালন করলে তাতে আগুনের ক্রিয়া প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। সুতরাং নিমেষে সে স্তর ভেদ করে থাকলে তাঁর শরীর আগুনের ক্রিয়া থেকে অক্ষত থাকা বিচিত্র নয়। হযরত আয়েশা (রা)-এর এক উক্তির দ্বারাও সশরীরে মি'রাজ অস্বীকারকারিগণ আরেকটি নকলী দলীল পেশ করে থাকে। তিনি বলেন ঃ

والله ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ليلة الاسراء

—"আল্লাহ্র কসম! মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্র (সা)-এর শরীর মোবারক নিখোঁজ হয়নি।"

কেউ কেউ এর জবাব দিয়েছেন যে, তখন তিনি হুযূর (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন কোথায় ? তদুপরি তাঁর বয়স তখন চার কি পাঁচ বছর মাত্র। অধিকন্তু ইমাম যুহরীর বর্ণনামতে নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে মি'রাজ সংঘটিত হয়ে থাকলে সে বছর মাত্র তাঁর জন্মই হলো। কাজেই এ বিষয়ে তাঁর বর্ণনার বিপক্ষে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণের রেওয়ায়েতই গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু উক্ত জবাবের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, হযরত আয়েশা (রা) যাচাই-বাছাই ছাড়াই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে আমরা এ জাতীয় ধারণা পোষণ করার পক্ষপাতী নই। আর কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দুঃসাহস করা উচিতও নয়। কেননা যদিও তিনি তখন নবী করীম (সা)-এর সাহচর্যে উপস্থিত ছিলেন না এবং অল্প বয়স্কা ছিলেন, কিন্তু রেওয়াতের বর্ণনাকালে তো তিনি বিবেকসম্পন্না ও প্রাপ্ত বয়স্কা। এমতাবস্থায় বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া বর্ণনা কার্য তাঁর দ্বারা সম্পাদন হতে পারে না। তাই

ধরে নিতে হবে—অবশ্যই যাচাই-বাছাই করার পর-ই তিনি এ বর্ণনা দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর রেওয়ায়েত সম্ভবত অন্য কোন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। কেননা মি'রাজের ঘটনা একাধিক বলেও বর্ণিত রয়েছে। তাহলে কোন প্রশ্নই থাকে না। আমার মনে এর অন্য একটা জবাবের উদয় ঘটেছে যা অতি সূক্ষ্ম ও তত্ত্বপূর্ণ। তা'হলো فقدان এর অর্থ দু'টি—(১) বস্তুর স্থানচ্যুত হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া এবং (২) খোঁজ করা, তালাশ করা। কুরআন করীমে দ্বিতীয় অর্থে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আল্লাহ্র বাণী ঃ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ

অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ আওয়াজ দানকারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বললেন ঃ "তোমরা কি খোঁজ ?" উক্ত আয়াতে فقدان-এর অর্থ তালাশ করাই অধিক ফুটে উঠেছে। সুতরাং এখন হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনার অর্থ দাঁড়ায়—হুযূর (সা) তত বেশি সময় ঘর থেকে নিখোঁজ থাকেন নি যে, তাঁকে তালাশ করতে হবে। পক্ষান্তরে এর অর্থ এই নয় যে, ঘর ছেড়ে তিনি কখনো বাইরে যাননি—যার ফলে এর দ্বারা শারীরিক মি'রাজের বিপক্ষে কিংবা আধ্যাত্মিক মি'রাজের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। বরং ব্যাপারটি হলো—তিনি ঘর থেকে পৃথক হয়েছেন সত্য, কিন্তু এত বেশিক্ষণের জন্য নয় যে, বাড়ির লোকজন চিন্তিত হবেন এবং তালাশের পর্যায় পর্যন্ত গড়াবে। পক্ষান্তরে যদি فقدان-এর প্রচলিত অর্থ যে, "মি'রাজের রাতে হুযূর (সা) নিখোঁজ হননি" ধরা হয় তবু মি'রাজ স্বপ্নযোগে কিংবা রূহানী হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা এ ক্ষেত্রেও এর অর্থ এটা নয় যে, হুযূর (সা) সে রাতে ঘর ছেড়ে বেরই হন নি। কারণ فقدان শব্দটি সকর্মক ক্রিয়ার ধাতু বা শব্দমূল, অকর্মক ক্রিয়ার নয়। তাই এর অর্থ—পৃথক, অদৃশ্য বা নিখোঁজ হওয়া নয় বরং হারিয়ে ফেলা, অদৃশ্য বা আড়াল করা যার জন্য একজন অদৃশ্যকারী ও অপরজন আড়ালকৃত ব্যক্তি বা বস্তু নির্মিত হওয়া জরুরী। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা)-এর রেওয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়—মহানবী (সা) সে রাতে ঘর থেকে কেউ নিখোঁজ বা অদৃশ্য অবস্থায় পায়নি আর এটাই সঠিক অর্থ। কেননা আপনজনদের সাথে সে রাতে তিনিও রীতিমত নিজ গৃহে শয়ন করেছিলেন। মি'রাজের ঘটনা এমন সময় ঘটেছিল স্বভাবত অন্যরা যখন নিদ্রামগ্ন। অতঃপর বাড়ির লোকজন জাগার পূর্বে ভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি কেবল ফিরেই আসেননি বরং নিজে তাদেরকে ফজরের নামাযের জন্য ডেকে ওঠান। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টিই হয়নি যে, মধ্যরাতে ঘুম থেকে কেউ জেগেছিল অথচ তাঁকে উপস্থিত পায়নি। অতএব রেওয়ায়েতের মর্ম সঠিক ও বক্তব্য স্পষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকু অর্থ গ্রহণ করাই যথেষ্ট।

মোটকথা নিঃসন্দেহে তাঁর মি'রাজ ছিল শারীরিক এবং সশরীরেই তিনি সাত আকাশ ভ্রমণ করেছেন। এটা অস্বীকার করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। অধিকন্তু এ ঘটনার অন্তরালে মহানবী (সা)-এর কামাল বা পূর্ণত্ব নিহিত রয়েছে। —আররফ ওয়াল-ওয়াযা', পৃ. ৩৩

প্রশ্ন ঃ ১৪. আপনাদের নবী (সা) ভোগ-বিলাস ত্যাগী ছিলেন না। তিনি নয়টি বিয়ে করেছিলেন।

উত্তর ঃ আজকাল খৃস্টানরা "আমাদের নবী ভোগবাদী ছিলেন না" বলে গর্ব করে আর "তোমাদের নবী ভোগবাদী ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন যে, নয়টি বিয়ে করেছেন" ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে মুসলমানদের প্রতি কটাক্ষ করে থাকে। যার ফলে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের সামনে বিব্রত হয়ে পড়ে। এর জবাবে কথা হলো—বৈরাগ্য তাকওয়ার অনিবার্য শর্ত হিসাবে বিবেচিত হলে নবী করীম (সা) অবশ্যই বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতেন, বিরুদ্ধবাদীরা যেন মুসলমানদের উপর কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশই না পায়। যার অপ্রিয় ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এমনি বিতর্ককালে জনৈক বে-আদব খৃস্টানের এহেন প্রশ্নের জবাবে এক গণ্ডমূর্খ মুসলমান বলে বসল ঃ "প্রথমে তুমি প্রমাণ কর যে, 'ঈসা (আ)-র মধ্যে পুরুষত্বও বর্তমান ছিল। তবেই তাঁর বিয়ে না করা নিয়ে গর্ব করতে এসো।" কিন্তু এটাও নিছক বে-আদবী। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে এ জাতীয় ত্রুটি থাকার কোন সন্দেহ অন্তরে স্থান দেয়া আদৌ উচিত নয়। কেননা সহীহ্ বুখারীতে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উক্তি বর্ণিত রয়েছে। শীর্ষস্থানীয় সাহাবী-গণ নীরব থাকার ফলে যা বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার পর্যায়ভুক্ত। উক্তিটি হলো ঃ

كذالك الرسل تبعث فى احساب اقوامنا –

অর্থাৎ রাসূলগণ আমাদের সর্বাপেক্ষা অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। حسب বলা হয় সৃষ্টিগত পূর্ণতাকে। যদ্দ্বারা বোঝা যায় নবী (আ)-গণ চূড়ান্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত হয়ে থাকেন; তাঁদের আনুগত্যে যেন কারো মনে কোন সংকোচ জাগ্রত না হয়। বলা বাহুল্য, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি আপনি জানতে পারেন যে, লোকটি পুরুষত্বহীন, তার প্রতি আপনার মনে তখন ঘৃণার ভাব আসা এবং তার আনুগত্যে মানসিক বাধার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আপনার নজরে তৎক্ষণাৎ সে হেয়-প্রতিপন্ন হবে। কারো প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা তখনই পূর্ণ মাত্রায় জমতে পারে যদি দেখা যায় লোকটির মধ্যে সকল রিপুর তাড়না বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সংযমের বেলায় সে ফেরেশতাতুল্য। পক্ষান্তরে রিপুর তাড়নাহীন ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ মাত্রায় ভক্তি-শ্রদ্ধা না আসাটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই তাফসীরকারগণ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে

কুরআনের শব্দ حصورا -এর অর্থ صبورا তথা "অধিক সবরকারী" ও "চরম আত্মসংযমী" বলে বর্ণনা করেছেন এবং নপুংসক বর্ণনাকারী তাফসীর প্রত্যাখ্যান করেছেন।

كذا فى الشفاء معللا بان هذه نقيصه و عيب ولاتليق بالا نبياء عليهم السلام –

—'শিফা' গ্রন্থে এর কারণ উল্লেখ হয়েছে যে, নপুংসক হওয়াটা দৈহিক ত্রুটির বিষয়, যা নবীগণের জন্য শোভনীয় নয়।

বরং এর উদ্দেশ্য হবে তিনি বড় আত্মসংযমী ব্যক্তি ছিলেন। কাজেই 'শিফা' ইত্যাদি জীবনী গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় যে, শেষ জীবনে তিনি বিয়ে করেছিলেন। এর দ্বারা তাঁর পুরুষত্বহীন হওয়ার ধারণা অসার প্রতিপন্ন হয়। বরং তিনি এমন শক্তিশালী সুপুরুষ ছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর যৌবনের তেজ রীতিমত বহাল ছিল। আর হযরত 'ঈসা (আ) শেষ যমানায় অবতরণ করার পর বিয়ে করবেন। এমন কি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ويولدله যে, তাঁর সন্তানও হবে। তাহলে তাঁর মধ্যে শারীরিক ত্রুটির কোন অবকাশই থাকতে পারে না। বস্তুত এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, তিনি এমন শক্তির অধিকারী ছিলেন যে, হাজার হাজার বছর ফেরেশতাদের সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও তা হ্রাস পায়নি। বরং এ দ্বারা বাহ্যত তাঁর শক্তি হুযূর (সা)-এর চাইতে অধিক বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হুযূর (সা) সার্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্যে আম্বিয়াগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কুরআন-হাদীস দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত। কাজেই সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মোটকথা, সংযমের জন্য বৈরাগী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। নতুবা নবী করীম (সা) বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িত হতেন না। বস্তুত ভোগ-বিলাস হ্রাস করার মধ্যেই আত্মসংযমের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সাহাবীগণের অনুমানের ভিত্তিতে হুযূর (সা) ত্রিশজন, কোন কোন রেওয়ায়েতক্রমে চল্লিশজন পুরুষের সমপরিমাণ বলে বলীয়ান ছিলেন। আর একজন পুরুষ চারজন মেয়ের সমান বলে বিবেচিত। সে মতে শরীয়ত একজন পুরুষের পক্ষে চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে। সে হিসাবে একশ বিশ আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী একশ ষাটজন স্ত্রী রাখার মত যথেষ্ট শক্তি তাঁর ছিল। বরং শারহে শিফা গ্রন্থে আবূ নঈমের উদ্ধৃতিক্রমে মুজাহিদ বলেন ঃ উল্লেখিত চল্লিশজন পুরুষ হবে বেহেশ্তী পুরুষ। আর তিরমিযীর বর্ণনা মতে বেহেশ্তের প্রত্যেক পুরুষ দুনিয়ার সত্তরজন পুরুষের সমপরিমাণ শক্তিশালী। অপর এক রেওয়ায়েতে একশত পুরুষের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে হিসাব মতে তিনি তিন হাজার পুরুষ অপর হিসাবে চার হাজার পুরুষের সমান শক্তিশালী ছিলেন। সুতরাং এমতাবস্থায় কেবল নয়জন স্ত্রীর উপর সবর করাটা তাঁর চরম আত্মসংযমের

পরিচায়ক। অধিকন্তু বৈবাহিক সম্পর্কে আদৌ না জড়িয়ে একেবারে সংযম অবলম্বন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। তাঁর যৌবনের সংযমী আচরণ এর প্রতিই ইঙ্গিত দেয় যে, পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়স্কা এক বিধবাকে তিনি জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কোনও যুবকের পক্ষে এহেন বয়স্কা তদুপরি বিধবা মহিলার পাণি গ্রহণ সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই ভরা যৌবনে চল্লিশ বছর বয়স্কা মহিলাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করা এবং যৌবনকাল এরই সাথে কাটিয়ে দেয়াতে এটাই প্রমাণ হয় তিনি বিলাসপ্রিয় তো ননই, বরং চূড়ান্ত পর্যায়ের সংযমী ছিলেন। তা সত্ত্বেও জীবনের শেষ ভাগে তিনি নয়টি বিয়ে করেছেন, নিশ্চয়ই এতে কোন হিকমত বা রহস্য জড়িত থাকা বিচিত্র নয়। সেগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়।

(এক) ঃ কোন কোন আরেফীন বা সূফী-সাধক বর্ণনা করেছেন যে, প্রেমই হলো বিশ্ব সৃষ্টির মূল উৎস। যেমন— كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق (অর্থাৎ আমি ছিলাম গোপন ভাণ্ডার, পরিচিত হওয়ার আমার ইচ্ছা হলো। তাই জগত সৃষ্টি করলাম।) হাদীস দ্বারা বোঝা যায়। অবশ্য মুহাদ্দিসগণের নিকট আলোচ্য হাদীসটির ভাষা যদিও এরূপ বলে প্রমাণিত না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু— ان الله جميل يحب الجمال (অর্থাৎ আল্লাহ সুন্দর আর সৌন্দর্যকে তিনি ভালবাসেন) বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইতিপূর্বে অষ্টাদশ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে এবং কলীদে মস্‌নবীর ১ম দফ্‌তরে উল্লিখিত

قبول کر دند خلیقه هدیه را تحت

شعر گنج مخفی بدر پیری جوش کرد

ছন্দে আমি বর্ণনা করেছি। এ তো গেল ভূমিকার একাংশ। দ্বিতীয় অংশ হলো—এ মহব্বতের সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কে। বিশেষ কোন পন্থা অবলম্বন করা ছাড়াই এর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন-প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। যেমন নির্মল প্রেমের অনুরাগে كن (হয়ে যা)-এর নির্দেশের মধ্যেই বিশ্ব জাহান সৃষ্টির কারণ নিহিত রয়েছে। এতে অন্য কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন পড়েনি। সুতরাং আরিফ তথা সাধক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে মিলনের মধ্যে সৃষ্টির তাজাল্লী বা কিরণ প্রত্যক্ষ করেন। তাই তাঁরা বিয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকেন। কোন কোন আরিফ ব্যক্তি حببت من دنيا كم النساء (পার্থিব বিষয়সমূহের মধ্যে নারীকুল তোমাদের সর্বাধিক প্রেমবিজড়িত বস্তু) হাদীসের মূল রহস্যের অন্তর্নিহিত উৎসরূপে একে উল্লেখ করেছেন।

(দুই) ঃ হুযূর (সা)-এর একাধিক বিয়ের দ্বিতীয় তাৎপর্য ছিল উম্মতের সামনে স্ত্রীদের সাথে আচরণ-বিধির আদর্শ ফুটিয়ে তোলা। নিজে বৈবাহিক সম্পর্কে না জড়িয়ে নারীর অধিকার সংক্রান্ত তাঁর শিক্ষা অধিক ফলপ্রসূ না হবার সম্ভাবনা ছিল অধিক। কারো মনে একটা সন্দেহের বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র ছিল না যে, তিনি নিজে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িত নন। তাই তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্তে নারী জাতির এতসব অধিকার-সংক্রান্ত বিধি নির্দেশ করা সম্ভব, নতুবা নিজে বিয়ে করলে তাঁর পক্ষেও এসব দায়-দায়িত্ব কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। এখন কারো মুখে একথা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। কেননা হুযূর (সা) উম্মতের চেয়ে অধিক বিয়ের পরও সকলের অধিকার যথাযোগ্য পালন করে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে। কারণ স্ত্রীর সাথে স্বামীর দ্বিমুখী সম্পর্ক রয়েছে। (১) স্ত্রীকে স্বামীর অধীন করা হয়েছে, সে হিসেবে উভয়ের মধ্যে নায়েব-মনিবের সম্পর্ক। (২) দ্বিতীয়ত পুরুষ প্রেমিক, আর নারীর ভূমিকা প্রেয়সীর। সুতরাং উভয়ের মধ্যে প্রেমের নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান। আধিপত্যের সংস্পর্শে প্রেমের রেয়াত করাটা বড় কঠিন ব্যাপার। প্রায়শ এমনও ঘটতে দেখা যায়—কেউ হয়ত মহব্বতের হক আদায় করতে গিয়ে প্রাধান্যের হক নষ্ট করে বসে। কাজেই স্ত্রী-প্রেমিক বলে খ্যাত স্বামীদেরকে সাধারণত স্ত্রীর দাসত্ব শৃঙ্খলেই বিজড়িত দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে প্রভাব খাটানো তাদের পক্ষে সম্ভব হতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যারা স্ত্রীর ওপর একচ্ছত্র প্রাধান্য সৃষ্টি করে চলে, মহব্বতের হক আদায় করা তাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না। উভয় দায়িত্ব সমভাবে পালন করে যাওয়া যে, একদিকে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের প্রভাব অপরদিকে অকৃত্রিম ভালবাসা ও অনাবিল প্রেমের পরশে স্ত্রীকে হৃদয়ের রাণী করে নেয়া। যার ফলে সে স্বামীর সাথে মন খুলে হাসি-তামাশা এবং মান-অভিমানের ভূমিকা নিঃসংকোচে পালন করে যেতে পারে। এ ভূমিকা একজন পূর্ণ মানবের চরিত্রেই লক্ষ করা যেতে পারে যা একমাত্র হুযূর (সা) অথবা তাঁর পূর্ণ আনুগত্যশীল ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে একবার নবী করীম (সা) হযরত খাদীজা (রা)-এর পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন ঃ "আপনি সে বৃদ্ধার স্মৃতিচারণ করছেন অথচ মহান আল্লাহ আপনাকে তাঁর চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।" অতঃপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়—فغضب حتى قلت والذى بعثك بالحق لا اذكرها بعد هذا الا بخير অর্থাৎ হুযূর (সা) ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন। যার ফলে হযরত আয়েশা (রা) ভীত-বিহবল চিত্তে আরয করলেন ঃ সেই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ প্রেরণ করেছেন, এখন থেকে আলোচনা

উঠলে একমাত্র তাঁর উত্তম দিকটাই উল্লেখ করব। এই ছিল হযরত আয়েশা (রা)-এর ওপর তাঁর প্রভাবের অবস্থা, যিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে সবচেয়ে অভিমানী। তাহলে অন্যান্য স্ত্রীর অবস্থা কি হতে পারে সেটা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অতএব অভিমান আর প্রভাবকে একত্র করা মুখের কথা নয়।

(তিন) ঃ একাধিক বিয়ের দ্বারা মহানবী (সা) সেসব লোকের জন্য আদর্শ স্থাপন করেছেন যাদের একের অধিক স্ত্রী রয়েছে যে, স্ত্রীদের সাথে কিভাবে ইনসাফ ভিত্তিক আচরণ করতে হবে। বিশেষত অন্যদের তুলনায় যদি কোন একজনের সাথে মহব্বতের মাত্রা অধিক হয়, সেক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে এমন উক্তি করা উচিত নয়, যাতে একজনের প্রতি প্রাধান্য ও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় বরং নিজের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে পূর্ণ সমতার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

সুতরাং হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে তাঁর আন্তরিক মহব্বত অধিক হওয়া সত্ত্বেও ইনসাফের বেলায় তিনি কোন পার্থক্য সৃষ্টি না করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) এবং অন্যান্য স্ত্রীর মধ্যে সর্বদা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন। পক্ষান্তরে একজনের প্রতি মনের ঝোঁক অধিক হওয়াটা ছিল তাঁর ক্ষমতা ও এখতিয়ারের বাইরের বিষয়। এ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করাটা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কাজেই তিনি ইরশাদ করতেন ঃ

اللهم هذا قسمى فى ما املك فلا تلمنى فيما لا املك -

—হে আল্লাহ্! সামর্থ্যানুযায়ী এই হলো আমার পক্ষ থেকে সমতা ও সাম্য। সুতরাং ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়ের জন্য আমাকে অভিযুক্ত করো না।

এতে হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি তাঁর মনের অধিক ঝোঁকের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। আর এটা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে ছিল না বরং গায়েবী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তাঁর মন হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং বিয়ের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা)-এর রেশমী কাপড়ে জড়ানো চিত্র হুযূর (সা)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন যে, ইনি আপনারই সহধর্মিণী। খোলার পর দেখতে পান তাতে হযরত আয়েশা (রা)-এর ছবি জড়ানো রয়েছে। বলা বাহুল্য—আলমে আখিরাতে ছবি তোলা জায়েয। সেখানে আপনাদের কেউ ছবি তোলার আগ্রহ দেখালে আমরা বারণ করব না। অন্য কোন স্ত্রীর সাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, ওহীর ক্ষেত্রেও হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপার অন্যান্য বিবি থেকে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল যে, হুযূর (সা) অন্য কোন স্ত্রীর সাথে শোয়া অবস্থায় ওহী আসত না, কিন্তু হযরত আয়েশা

(রা)-এর সাথে একই লেপের নিচে শোয়া অবস্থায়ও তাঁর ওপর যথারীতি ওহী নাযিল হতো। মোটকথা, এসব ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়—হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি তাঁর আকর্ষণের সকল উপকরণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। তদুপরি তাঁর জন্মগত মেধা, ধী-শক্তি ও দূরদর্শিতা ছিল সোনায়-সোহাগা। হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি তাঁর অধিক মহব্বতের মূল কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে অধিক ভালবাসতেন। সুতরাং হুযূর (সা)-এর মহব্বত হবে না কেন। এতসব সত্ত্বেও অন্তরের ভালবাসা ছাড়া তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণ সবার সাথে অভিন্ন ছিল। অধিকন্তু পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে তিনি মাত্র নয় বছরের বালিকা হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অল্পবয়স্কা কুমারী স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারের একটা বাস্তব চিত্র উম্মতের সামনে পেশ করা। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের আচরণ সাধারণত নিজেদের বয়স অনুসারেই হয়ে থাকে। কিন্তু হুযূর (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে এমন ব্যবহারের সূচনা করেছিলেন যা তাঁর বয়সের সাথে খাপ খায়। তিনি তাঁর বয়সের প্রতি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য রাখতেন। সুতরাং কোন এক ঈদের দিন হাবশী যুবকরা খেলা করছিল। হযরত আয়েশা (রা)-কে তিনি হাবশীদের খেলা দেখবেন কি-না জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলে হুযূর (সা) স্বয়ং পর্দার ব্যবস্থা করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁকে সে খেলার আনন্দ উপভোগ করান। শাব্দিক অর্থেই কেবল খেলা ছিল নতুবা প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এক প্রকারের শারীরিক ব্যায়াম যা সৎ উদ্দেশ্যে করা হলে ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। যেহেতু সে খেলোয়াড়দের দেখার মধ্যে ফিতনার কোন আশংকা ছিল না, কাজেই পরপুরুষকে কিভাবে দেখলেন এ প্রশ্নও আসতে পারে না। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) নিজে সরে না আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে খেলা দেখতে সাহায্য করেন। বাল্য বয়সহেতু হযরত আয়েশা (রা)-এর পুতুল নিয়ে খেলা করার খুবই আগ্রহ ছিল, (এগুলো নামে মাত্র পুতুল যেসব কোন চিত্র বা ফটো ছিল না) এ জন্য মহল্লা থেকে প্রতিবেশিনী সমবয়সী মেয়েরা হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে খেলা করতে আসত। হুযূর (সা) বাড়ি আসলে খেলা ছেড়ে তারা সরে যেত। তিনি তাদেরকে এই বলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন যে, পালাচ্ছ কেন, আস তোমরা খেলা কর। নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে একবার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন, দেখা যাক কে আগে যেতে পারে। হযরত আয়েশা (রা) তখন হালকা-পাতলা ছিলেন। তাই হুযূরের আগে সীমা পার হয়ে যান। কিছুদিন পর তিনি পুনরায় প্রতিযোগিতা করেন। এবার হযরত আয়েশা (রা) মুটিয়ে গিয়েছিলেন, তাই তিনি হেরে যান। হুযূর (সা) বললেন ঃ এটা পূর্বেকার প্রতিশোধ।

এখন বলুন! কুমারী স্ত্রীর মনোরঞ্জন ও মন যুগিয়ে চলা এহেন বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র নবী করীম (সা) ছাড়া দ্বিতীয় কার পক্ষে সম্ভব ? বয়স্ক লোকদের পক্ষে এ ধরনের আচরণ সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে সে আচরণই করেছেন, যা কোন যুবক স্বামী তার যুবতী স্ত্রীর প্রতিই সম্পাদন করতে পারে বরং যুবকের পক্ষেও ততটুকু সম্ভব নয় যা আল্লাহ্‌র নবী (সা) বাস্তবে কার্যকর করে দেখিয়েছেন।

মানুষ আজকাল আত্মসম্মান, আত্মসম্মান বলে চিৎকার করে থাকে। আসলে সেটা কি ? বস্তুত তা আত্মগর্ব বৈ নয়। একেই তারা আত্মসম্মান নামে অভিহিত করছে। মূলত আত্মসম্মান-বিরোধী কাজ তা-ই যদ্দ্বারা দীনের ওপর আঘাত আসে। আর যে কাজের দ্বারা দীনের ব্যাপারে কোন আঘাত পড়ে না কিন্তু ব্যক্তি চরিত্রের রসময়তা প্রকাশ পায় সেটাকে বলা হয় তাওয়া'যু বা বিনয়-নম্রতা। বর্তমানে আত্মসম্মানের পোটলা বগলদাবা করে স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাকে যারা আত্মমর্যাদার পরিপন্থী মনে করে, মুখ সামলে তারা চোখ খুলে দেখুক যে, হুযূর (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। তবে কি (আল্লাহ্ না করুন) মহানবী (সা)-এর ঐ আচরণকেও তারা আত্মসম্মান-বিরোধী বলে মনে করে ? আদৌ নয়। আর কেউ যদি করে তবে তার ঈমানের খবর নেয়া দরকার। সুতরাং হুযূর (সা)-এর কাজ আত্মসম্মান-বিরোধী নিশ্চয়ই ছিল না। অবশ্য মনগড়া তথাকথিত আত্মসম্মানের পরিপন্থী ছিল বটে। সুতরাং সম্মানের দাবিদাররা যদি আত্মগর্বী না হয়, তবে স্ত্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আমাদের দেখাক। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত তাদের দ্বারা এটা হবার নয়। অবশ্য যারা অহংকারী নয় এবং নবী করীম (সা)-এর পূর্ণ অনুসারী তাদের পক্ষে অবশ্যই এটা সম্ভব। আল-হামদুলিল্লাহ, এ সুন্নতের ওপর আমল করার ভাগ্য আমাদের হয়েছে।

(চার) ঃ এর মধ্যে অপর একটি হিকমত বা কল্যাণ রয়েছে। আর তা হলো, নারী জাতি সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ হুকুম অপর নারীদের পক্ষে কেবল স্ত্রীদের মাধ্যমে অবগত হওয়াই সহজ ও সম্ভব। তাতেও আবার ব্যক্তিবিশেষের আচার-আচরণে, আদত-অভ্যাসে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। কাজেই মাধ্যম ও সূত্র বিভিন্ন হওয়াতে সকল বিধি-বিধান প্রকাশ পাওয়াটা সহজ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বিবাহিতা স্ত্রী-ই এর একমাত্র মাধ্যম বা সূত্র হতে পারে।

মোটকথা, নবী করীম (সা)-এর বহু বিবাহে যেসব কল্যাণ নিহিত ছিল নমুনাস্বরূপ তার মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। নতুবা এতে আরো এত অধিক

কল্যাণ রয়েছে আজীবন বর্ণনা দিলেও যেগুলো ফুরাবে না। তা সত্ত্বেও ইচ্ছা করলে তিনি জীবনভর সবর করতে পারতেন। যেমনিভাবে পূর্ণ যৌবনকাল কাটিয়েছেন চল্লিশোর্ধ এক বিধবা সহধর্মিণীর সাথে। বস্তুত কল্যাণধর্মী এসব বিভিন্ন কারণেই তিনি বহু বিবাহে মনোযোগী হয়েছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈরাগ্যবাদ নয় বরং তাক্ওয়া ও আত্মসংযম অনুশীলনের মাধ্যমে ভোগ-বিলাস সীমিত করাটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অন্যথায় নবী করীম (সা) অবশ্যই বৈবাহিক সম্পর্ক এড়িয়ে যেতেন।

— তকলীলুল কালাম, পৃ. ৩২

প্রশ্ন ঃ ১৫. আপনাদের নবীর কৌতুকপ্রিয়তা আত্মসম্মানের পরিপন্থী।

উত্তর ঃ নবী করীম (সা)-এর কৌতুকের অন্তরালে বিভিন্ন হিকমত বা প্রজ্ঞা নিহিত ছিল। প্রথমত সাহাবীদের মনে আনন্দ দান করা। আর বন্ধু-বান্ধবের মনে আনন্দ দান করা ইবাদত। আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা ফাতাহ্ মুহাম্মদ সাহেবকে বলতে শুনেছি যে, একবার তিনি হাজী এমদাদুল্লাহ্ (র)-এর খেদমতে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনার পর বিদায়কালে বললেন ঃ আজকে হুযূরের অনেক সময় নষ্ট করলাম, আপনার ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম। হাজী সাহেব বললেন ঃ শুধু নফল পড়াই কি ইবাদত, বন্ধুদের সাথে আলাপ করা কি ইবাদত নয় ? এটা তুমি কি বললে যে, সময় নষ্ট করেছি, আসল ব্যাপার তা নয় বরং এ পূর্ণ সময়টা ইবাদতের মধ্যেই কেটেছে। এমনিভাবে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (র) ফজরের নামাযের পর কোন কোন সময় মুসাল্লায় বসে ইশরাকের সময় পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। সাধারণ লোকেরা মনে করে এ সময়টা ইবাদতবিহীন অযথা ব্যয় হলো। কিন্তু তিনি এ সময়কেও ইবাদতের মধ্যে আছেন বলে মনে করতেন। কেননা মু'মিনের মন খুশি করাটাও ইবাদতের শামিল। এই হলো হুযূর (সা)-এর কৌতুকের এক রহস্য। দ্বিতীয় হিকমত ছিল যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। যৌবনে আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, রাণী ভিক্টোরিয়া এমন এক যানবাহনে আরোহিতা যার সাথে ইঞ্জিন, ঘোড়া অথবা গরু কোনটাই সংযুক্ত ছিল না। তখন আমি যানবাহনটির সঠিক পরিচয় জানতাম না। কিন্তু আজকাল দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত সেটা ছিল মোটর লরী জাতীয় যানবাহন। যা হোক দেখতে পেলাম রাণী ভিক্টোরিয়ার যানবাহনটি থানাভুনের অলি-গলিতে চক্কর দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর নিজেকেও আমি সে একই সওয়ারীতে উপবিষ্ট লক্ষ করলাম। এমতাবস্থায় রাণী ভিক্টোরিয়া আমাকে লক্ষ করে বললেন ঃ ইসলামের সত্যতার মধ্যে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা বিষয়ে মন দ্বিধা জড়িত। এর সমাধান হয়ে

গেলে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহের অবসান ঘটে যাবে। আমি বললাম, বলুন সন্দেহটা কি ? বললেন ঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) সময় সময় কৌতুকও করতেন। (এটা আত্মমর্যাদার পরিপন্থী, অথচ নবীর জন্য আত্মমর্যাদাশীল হওয়াটা অনিবার্য। বস্তুত এ প্রশ্ন মূলত রাজা-বাদশাদেরই উপযোগী। কেননা আত্মসম্মান রক্ষায় তারাই অধিক সচেষ্ট।) জবাবে আমি বললাম ঃ নবী করীম (সা)-এর কৌতুক বা রসাত্মক বাণী ছিল বিশেষ হিকমত তথা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীন। তা হলো—আল্লাহ্ পাক তাঁর সত্তায় এমন প্রভাব ও দীপ্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্যের কিস্‌রা পর্যন্ত রাজ সিংহাসনে বসে তাঁর নাম শুনে ভয়ে ভীত-বিহবল হয়ে যেত। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

نصرت بالرعب مسيرة شهر

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক মাসের দূরত্ব অতিক্রমকারী প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর থেকে এক মাসের দূরত্বে অবস্থানকারী লোকদের অন্তরে পর্যন্ত তাঁর প্রভাব-দীপ্তি বিস্তৃত ছিল। নিকটবর্তী লোকদের কথা বলাই বাহুল্য। হুযূর (সা) তো ছিলেন আল্লাহর নবী, মহামানব, তাঁর কথা আলাদা। হযরত উমর, হযরত খালিদ (রা)-এর ন্যায় তাঁর গোলামদের নাম শুনেও সম্রাটগণ ভয়ে কম্পমান থাকত। এটা জানা কথা, হুযূর (সা) কেবল শাসকই ছিলেন না রাসূলও ছিলেন। যাঁর দায়িত্ব হলো—উম্মতের আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক ও চারিত্রিক সংশোধন করা। শিক্ষা দেয়া ও নেয়ার এক অনাবিল প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতেই কেবল এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। যার জন্য শর্ত হলো—শিক্ষা গ্রহণকারীর অন্তর শিক্ষা দানকারীর সামনে প্রসন্ন হওয়া, যেন নিঃসংকোচে সে নিজের অবস্থা প্রকাশ করে সংশোধন করে নিতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এত অধিক পরিমাণে প্রভাব দান করেছিলেন যা সাহাবীগণের শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করত। এ কারণে নবী করীম (সা) সময় সময় কৌতুক ও রসাত্মক বাক্যালাপ করতেন যাতে সাহাবীদের অন্তর খুলে যায়। আর সর্বদা প্রভাবান্বিত অবস্থায় থেকে ভাব প্রকাশ করতে তাঁরা যেন বিরত না থাকেন। কৌতুকমাত্রই আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্যের পরিপন্থী একথা স্বীকৃত নয়। বরং গাম্ভীর্যের পরিপন্থী কেবল সেই কৌতুক যার মধ্যে কোন হিকমত বা প্রজ্ঞা বিদ্যমান না থাকে। অধিকন্তু এটাও জানা কথা যে, মহানবী (সা)-এর কৌতুক দ্বারা আত্মসম্মানে কোন আঘাত পড়ত না। বরং এর দ্বারা সাহাবীগণের অন্তর প্রসন্ন হয়ে মনের সংকোচ ভাব দূর হয়ে যেত, সীমাহীন প্রভাবের দরুন স্বভাবত যা অন্তরে চেপে থাকত। যার ফলে ভীতির পরিবর্তে নবী করীম (সা)-এর মহব্বতে সাহাবীদের অন্তর

পরিপূর্ণ হয়ে যেত। তিনি সময় সময় এ ধরনের কৌতুক না করলে ভালবাসার স্থলে তাঁর ভীতির প্রাধান্য চেপে থাকত। কিন্তু মহব্বতের প্রাধান্য হওয়ার ফলে তাঁর প্রভাবে কোনরূপ কমতি দেখা দেয়নি বরং পূর্বের তুলনায় অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়। কেননা ইতিপূর্বের গাম্ভীর্যের ভিতর ছিল কেবল ভয়-ভীতি। এখন ভয় ও ভালোবাসা একত্রে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। কেউ যদি প্রশ্ন তোলে যে, কৌতুকের ফলে তো ভীতি উড়ে যায়? এর জবাব হলো ঃ এটা সে ক্ষেত্রেই সম্ভব যেখানে কৌতুককারীর প্রভাবে স্বল্পতা থাকে এবং কৌতুকের মাত্রা অধিক হয়। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর ন্যায় প্রভাব যদি প্রবল হয়, যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আর কৌতুকের আধিক্য না থাকে, তা হলে এমতাবস্থায় সম্বোধিত ব্যক্তি নির্ভয় হতে পারে না। সুতরাং বাস্তব ঘটনার আলোকে এবং হাদীসের বর্ণনা মতে জানা যায়—সাহাবীদের মনে হুযূর (সা)-এর প্রভাব যে কি পরিমাণ ছিল। কখনো কোন ব্যাপারে রাগান্বিত হলে হযরত উমরের ন্যায় শক্ত প্রাণের বীরপুরুষ পর্যন্ত নতজানু হয়ে বসে যেতেন এবং অক্ষমতার সুরে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দিতেন।

আমার এ জবাবের পর সম্রাজ্ঞী বললেন ঃ এখন আমার মনে প্রশান্তি এসে গেছে। ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এখন আমার আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নাই।

—আল হুদূদ ওয়াল কুয়ূদ, পৃ. ৯

প্রশ্ন ঃ ১৬. কাফিরের চেয়ে মুরতাদের স্তর নিকৃষ্ট পর্যায়ের কেন ?

উত্তর ঃ ইসলাম ত্যাগ করার দুটি পর্যায় রয়েছে ঃ (১) হয় প্রথম থেকেই সে ইসলাম গ্রহণই করেনি। (২) নয় কবূল করার পর বর্জন করেছে। উভয় অবস্থার সাজা এটাই, বরং শেষোক্ত অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় অধিকতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রদ্রোহীর সাজা সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিবেচিত হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই এ রাষ্ট্রের নাগরিক না বরং অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রজা। এমন সব লোকের ওপর জয়লাভ করলে হয় তাদেরকে গোলামে পরিণত করা হয় না হয় কৃপাবশত মুক্ত করে দেয়া হয় অথবা সম্মানের সাথে নজরবন্দী করা হয়। কিন্তু রাজদ্রোহীর সাজা প্রাণ সংহার করা কিংবা কালাপানিতে দ্বীপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। এর কারণ হলো—বিদ্রোহ রাষ্ট্রের জন্য অধিকতর অপমানজনক। তেমনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তা বর্জন করা ইসলামের পক্ষে চরম অপমানকর এবং অপরের কাছে ইসলামের মূল্যবোধকে হেয়প্রতিপন্ন করার শামিল। লক্ষ করুন, এক ব্যক্তি কখনো আপনার সুহৃদ ছিল না বরং আজীবন বিরোধিতাই করে আসছে, তার বিরোধিতায় আপনার তেমন কোন ক্ষতির আশংকা নেই। আপনার বিরুদ্ধে তার

দুর্নাম রটনায় মানুষ বড় একটা কান লাগায় না বা গুরুত্ব দেয় না। এর কারণ হলো—এ ধরনের শত্রুতামূলক আচরণ তো ইতিপূর্বে সে সব সময়ই করেছে। এটা নতুন কিছু নয়। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল আপনার বন্ধু থাকার পর শত্রু হয়ে যদি বিরোধীর ভূমিকায় নেমে আসে তাতে আপনার সমূহ ক্ষতির কারণ রয়েছে। তার বিরুদ্ধাচরণের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কেননা তখন মানুষ মনে করে কেবল শত্রুতাবশতই সে এহেন ভূমিকায় নেমে আসেনি, অবশ্যই এর মধ্যে কোন কারণ রয়েছে, নতুবা এতদিন তার বন্ধু রইল কিভাবে ? কাজেই মনে হয় দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের সুবাদে সে অমুকের গোড়ার খবর জেনে ফেলেছে। তাই এখন বিপক্ষে চলে গেছে। অথচ বন্ধুর ভেদের কথা জানার পরই বৈরী হওয়া জরুরী নয়। বরং সম্ভবত এ উদ্দেশ্যেই সে বন্ধু সেজেছিল যে, লোকেরা মনে করবে বন্ধুত্বের ছত্রছায়ায় আমি তার গোপন তথ্য জানতে পেরেছি। সে মতে আমার কথার প্রতি তাদের আস্থা সৃষ্টি হবে আর তথ্যভেদী হিসেবে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে। সুতরাং কোন কোন ইহুদী ইসলামের সাথে এহেন আচরণের মনস্থ করেছিল। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِا لَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ الـــنَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

—আহ্লে কিতাবদের একদল বলল—মু'মিনদের ওপর যা নাযিল হয় তার প্রতি ঈমান আন দিনের প্রারম্ভে আর শেষ ভাগে তা অস্বীকার করে বস, তাহলে সম্ভবত তারা ফিরে আসবে।

মোটকথা, বন্ধুর বিরোধিতার অন্তরালে এ ধরনের হঠকারিতার সম্ভাবনাও বিদ্যমান রয়েছে। (সংকলক) কিন্তু বন্ধুর বিরোধিতায় মানুষ সাধারণত খুব দ্রুত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে (আর সে সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি মেলার কারো অবকাশ থাকে না)। কাজেই শরীয়ত, বিবেক-বুদ্ধি ও আইনের দৃষ্টিতে সহযোগিতার পর বিরোধিতাকারী ব্যক্তি গুরুতর অপরাধী। সুতরাং ইসলামী শরীয়ত ধর্মত্যাগী মুরতাদের বিরুদ্ধে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনে কঠোর শাস্তির বিধান করেছে।

—মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ৯

প্রশ্ন ঃ ১৭. 'কবীরা গুনাহ্ ক্ষমাযোগ্য অপরাধ'—এ বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে মুসলমানগণ এতে অধিক মাত্রায় লিপ্ত হয়।

উত্তর ঃ এর একাধিক জবাব হতে পারে। (১) পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিণতি স্বীকার করে নিলে এর ফল এই হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল যে,

যেসব লোকের সম্পর্ক ইসলামের সাথে যত সুদৃঢ় যেমন—আলিম, মুত্তাকী ও সূফী-সাধক প্রমুখ এদের চরিত্রে এর প্রতিক্রিয়া অধিকতর প্রতিফলিত হওয়া। কেননা ধর্মের সাথে তুলনামূলকভাবে গভীর সম্পর্কশীল ব্যক্তির চরিত্রে এর প্রভাব অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়মের দাবি। অথচ বাস্তবের প্রেক্ষাপটে শুধু আমরাই নই, বিধর্মী কাফিররা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করে থাকে যে, ইসলামের সাথে যাদের সম্পর্ক গভীর সে সকল পুণ্যাত্মা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা সন্দেহপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে পর্যন্ত দূরে থাকতে তাঁরা সদা সচেষ্ট। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমার এক বি-এ পাস বন্ধুর ঘটনা মনে পড়ল। একবার তিনি রেলে ভ্রমণ করছিলেন। তার সাথে তখন পনর সেরের অধিক ওজনের মালপত্র। সময়ের অভাবে বুক না করেই তিনি গাড়িতে উঠে বসেন। কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌছে স্টেশনের কেরাণী বাবুর নিকট গিয়ে ঘটনা ব্যক্ত করে বললেন ঃ ওঠার সময় তো সময়ের স্বল্পতার দরুন মাল বুক করা সম্ভব হয়নি এখন আপনি ওজন দিয়ে এর মাশুল নিয়ে নিন। বাবু "আমার অবসর নেই" বলে মাশুল নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিনা ভাড়ায় সেগুলো নিয়ে যেতে বলল। তিনি বললেন ঃ কেরাণী সাহেব! এটা মাফ করার আপনি কে, আপনি তো রেলের মালিক নন বরং একজন বেতনভোগী কর্মচারী। মাশুল নেয়া আপনার কর্তব্য। কেরাণী এবারও অস্বীকার করায় তিনি স্টেশন মাস্টারের নিকট গেলেন। তারও একই জবাব—মাশুল লাগবে না, আপনি নিশ্চিন্তে নিয়ে যান। এবারও তিনি একই কথা বললেন ঃ ক্ষমা করার আপনার কোন অধিকার নেই। অতঃপর স্টেশন মাস্টার ও কেরাণী বাবুর মধ্যে এ নিয়ে ইংরেজিতে বাক্যালাপ হতে থাকে। তার লেবাস-পোশাক দেখে তারা ভাবল লোকটা ইংরেজি বুঝে না। যাহোক আলাপ-আলোচনা শেষে তারা সাব্যস্ত করল লোকটা মনে হয় শরাব পান করে এসেছে। নতুবা আমরা তার কাছ থেকে মাশুল নিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও এত পীড়াপীড়ি কেন ? তিনি বললেন ঃ মাস্টার সাহেব, আমি নেশাখোর নই বরং আমার ধর্মের হুকুম হলো নিজ দায়িত্বে কারো পাওনা হক বা অধিকার ঝুলিয়ে রাখবে না। অবশেষে তারা উভয়ে বলল ঃ এখন আমাদের পক্ষে এ মালপত্র ওজন দেয়া সম্ভব নয়। অগত্যা মালপত্র নিয়ে তিনি প্লাটফরমের বাইরে চলে গেলেন। চিন্তা করতে লাগলেন--আয় আল্লাহ্ ! এখন আমি রেল কোম্পানীর প্রাপ্য ঋণ থেকে কি উপায়ে নিজেকে মুক্ত করব ? অতঃপর আল্লাহ্ সহায় হয়ে তার অন্তরে উপায় নির্দেশ করে দিলেন যে, কোনও রেল স্টেশন থেকে অতিরিক্ত মালের মাশুলের সমপরিমাণ মূল্যের টিকেট কিনে ছিঁড়ে ফেললে রেলের পাওনা পয়সা যথারীতি কোম্পানীর ঘরে পৌছে যাবে। তাই সে পন্থাই তিনি অবলম্বন করলেন।

আমার অপর এক বন্ধু ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। ঘটনা হলো—ছেলেসহ একবার তিনি রেলে ভ্রমণ করছিলেন। ছেলেটি খর্বাকৃতি ছিল বলে দৃশ্যত দশ বছরের মনে হতো। অথচ তার বয়স তখন তের বছরের কাছাকাছি। রেলের আইনানুযায়ী তার ফুল টিকেট দরকার। পুরো টিকেট নিতে চাইলে সাথীরা বারণ করে বলল—একে তের বছরের কে বলবে, আপনি হাফ টিকেট নিয়ে নিন, কেউ কিছু বলতে পারবে না। তিনি বললেন—বান্দা কিছু না বলুক তাই বলে আল্লাহ্ও কি ছেড়ে দেবেন ? তিনি কি জিজ্ঞেস করবেন না অন্যায়ভাবে পরের হক কেন নষ্ট করলে ? যাই হোক তিনি পুরা টিকেটই নিলেন। এদিকে সঙ্গীদের প্রতিক্রিয়া ছিল লোকটা বোকা! কবির ভাষায় ঃ

اوست دیوانه که دیوانه شد

—অর্থাৎ বস্তুত সে-ই পাগল যার অন্তর সত্যের উন্মাদনা শূন্য।

মোটকথা, কোন জাতি নিজ সম্প্রদায়ের কোন সদস্যের এহেন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারবে না।

এ ঘটনাকে সন্দেহমূলক বলা হয়েছে সাধারণ লোকের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে। নতুবা প্রকৃতপক্ষে এটা সন্দেহের পর্যায়ভুক্ত বিষয় নয় বরং তা-হলো ওয়াজিব তথা অবশ্যপালনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং "কবীরা গুনাহ্ ক্ষমাযোগ্য" এ বিশ্বাসের ফলশ্রুতিই যদি মানুষকে পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করত তাহলে দীনদার ও আলিমগণেরই বে-পরোয়াভাবে এবং ব্যাপক হারে এতে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অথচ ইসলামের সঠিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞাত মুসলমানদের এ শ্রেণীর লোকরাই পাপাচার, গুনাহ্ ও সন্দেহজনিত বিষয় থেকে অধিকতর আত্মসচেতন এবং আত্মরক্ষাকারী। কাজেই বোঝা গেল, আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া এটা নয় যা প্রশ্নকর্তার ধারণা। বরং গুনাহ্ থেকে দূরে থাকা এবং পাপাচারের প্রতি ঘৃণাবোধ জন্মানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বিশ্বাসের প্রভাবে ঘৃণাবোধের কারণ একটু পরই ব্যক্ত করছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ঃ

چشم بد اندیش که برکنده باد
عیب نماید هنرش در نظر

—গুণ-বৈশিষ্ট্য যার দৃষ্টিতে দোষের কারণ এহেন কুচক্রীয় চোখ অন্ধ হওয়াই ভাল।

সুতরাং যে বিশ্বাসের শাণিত আঘাতে পাপাচারের শিকড় নির্মূল হয়ে যায় কুচক্রী লোকেরা সেটাকেই পাপের প্রেরণা ঠাওরাতে চায়। অতএব এ জবাব দ্বারা পাপাচারের প্রতি সৃষ্ট আগ্রহ-ইচ্ছা মুসলমানদের উক্ত বিশ্বাসের ফল বলে আপনাদের সে দাবি বাস্তব ঘটনা ও বিবেকানুভূতির আলোকে অসার প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

(২) এর যুক্তিপূর্ণ দ্বিতীয় জবাব হলো—"এ বিশ্বাসের কারণেই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়," মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি এ কথার প্রতি সমর্থন দেয় না। কেননা এর সারমর্ম কেবল এতটুকুই যে, কবীরা গুনাহ্ সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেয়ার একচ্ছত্র অধিকারী। কিন্তু কাকে ক্ষমা করবেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থাৎ এ কথা কারো জানা নেই যে, আমার সম্পর্কে مشيت الهى (আল্লাহ্র ইচ্ছা) ক্ষমার আকারে আমার অনুকূলে না (যোগ্য হিসেবে আইনের দৃষ্টিতে—সংকলক) শাস্তিরূপে প্রতিকূলে প্রকাশ পাবে। কাজেই এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষে আযাব থেকে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেকেরই মধ্যে এ আশংকা প্রবল যে, সম্ভবত এ বিধান আমার ওপরই প্রয়োগ করা হবে। একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যাক। যেমন ধরুন, পুরুষত্বহীন এক ব্যক্তি লোকলজ্জার কারণে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিষ পান করে। ঘটনাক্রমে সে বেঁচে যায় বরং বিষ হজম হয়ে তার দেহে পুরুষত্বশক্তি সঞ্জীবিত করে তোলে। কোন কোন জায়গায় এরূপ ঘটনা বাস্তবে ঘটেছেও। এখন কথা হলো, আকস্মিক এ ঘটনায় নির্ভরশীল হয়ে কেউ বিষ পানের দুঃসাহস দেখাতে পারে কি ? আদৌ এমন হতে দেখা যায় না। জ্ঞানবান মাত্রেরই জানা কথা যে, বিষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হলো প্রাণ বিনাশ করা কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী কোন কারণে এ ব্যক্তির মধ্যে বিষ তার সৃষ্টিগত স্বভাবের বিপরীত কাজ করেছে বিধায় যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য কেউ বিষ পানের দুঃসাহস সচরাচর দেখায় না। তদ্রূপ ক্ষেত্র বিশেষে এমনও হয় যে, প্রচলিত আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিছক দয়াবশত বাদশাহ হয়তো কোন খুনির প্রাণদণ্ড মওকুফ করে দেন। কিন্তু তাই দেখে প্রত্যেকে এ কাজের দুঃসাহস দেখাতে পারে না। কেননা জানা কথা যে, হত্যার নির্ধারিত সাজা ফাঁসি আর স্বভাবত এ বিধিই কার্যকর হয়ে থাকে। ক্ষমা কোন আইন নয়, নিছক রাষ্ট্রপতির দয়ার ওপর নির্ভরশীল। কার প্রতি তাঁর এ দয়া প্রদর্শিত হবে এটা জানা নেই। তাই এর ওপর ভরসা করে কেউ ফাঁসিযোগ্য অপরাধে অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং কবীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যাওয়া নিছক রাজকীয় দয়ার ব্যাপার। তাই এ বিষয়কে কি প্রকারে অপরাধ প্রবণতার প্রেরণাদায়ী কারণ সাব্যস্ত করা যেতে পারে ? অনুরূপ বনে-জঙ্গলে পায়খানা করে ঢিলা ভাঙ্গতে গিয়ে মাটির নিচে কেউ সোনার

কলস পেয়ে গেল। এখন এ আকস্মিকতার ওপর নির্ভর করে ক্ষেতি-খোলা, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তদ্রূপ কবীরা গুনায় অপরাধী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট আযাব থেকে মুক্তি দেয়া আকস্মিক ও দৈবাতের বিষয় মাত্র। কাজেই এটা অপরাধ প্রবণতার কারণ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও যারা এহেন গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হয়, মূলত সেটা তাদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক দোষের কারণে, আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাবে নয়।

(৩) অতঃপর শাস্তি না দিয়ে অপরাধী বিশেষকে ক্ষমা করে দেয়ার মূল হেতু কারো অজানা থাকার কথা নয় যে, এটাও কোন সৎ কাজের ফলশ্রুতিতেই হয়ে থাকবে। আবূ দাঊদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—এক ব্যক্তি কোন মামলার ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর সামনে মিথ্যা কসম খেয়ে বললো ঃ

اشهد بالله الذى لا اله الا هو ما فعلت ذالك –

অর্থাৎ সেই আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে বলছি যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই এরূপ কাজ আমি করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ فقال رسول الله بل قد فعلت لكن غفر الله لك باخلاص قول لا اله الا هو অবশ্যই তুমি এ কাজ করেছ (আর তুমি মিথ্যা কসম খাচ্ছ, যা গুরুতর অপরাধ) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য لا اله الا الله -এর বরকতে তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ই জানেন সে তখন কেমন অন্তরে আল্লাহ্‌র নাম নিয়েছিল যা আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয়ে গেছে।

(অর্থাৎ পরম নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ মনে সে তখন আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করছিল। যার বরকতে তার মিথ্যা কসমের শাস্তি মাফ হয়ে যায়।) এর অর্থ এ নয় যে, হুযূর (সা) তার অনুকূলে ডিক্রি দিয়েছিলেন। বরং "তার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে" কেবল এতটুকু ব্যক্ত করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। কেননা ওহীর মাধ্যমে মিথ্যা কসমের সংবাদ জানার পর সে ব্যক্তির অনুকূলে রায় দেয়া মহানবী (সা)-এর পক্ষে কি করে সম্ভব। তাহলে দেখুন! অপরাধ কত মারাত্মক, একে তো মিথ্যা কসম। তাও আবার আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে! বস্তুত রাসূলুল্লাহ্‌র সামনে মিথ্যা কসম খাওয়া যেন স্বয়ং খোদারই সামনে কসম খাওয়া। বলা বাহুল্য, স্থান-কাল ভেদে কাজের গুরুত্ব বেড়ে যায়। কথাটা আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায়, যেমন—যিনা করা অপরাধ, কিন্তু মসজিদে করা অধিকতর গুরুতর। এ একই কাজ কোন পাপিষ্ঠ যদি কা'বা ঘরে করে বসে তাহলে সেটা আরো মারাত্মক। এমনিভাবে মিথ্যা কসম খাওয়া গুনাহ্। কিন্তু হুযূর (সা)-এর সামনে খাওয়া অধিক গুনাহ্‌র ব্যাপার। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র নায়েব বা প্রতিনিধি তাই তাঁর সামনে মিথ্যা কসম খাওয়া যেন আল্লাহ্‌র সামনে খাওয়া। কেউ

হয় তো প্রশ্ন করতে পারে—আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ স্বয়ং আল্লাহ্‌র সামনে সম্পাদিত ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাজেই হুযূর (সা)-এর সামনে কিংবা আড়ালে মিথ্যা কসমের গুনাহ্ সর্বত্র একই পর্যায়ের হওয়া উচিত ? এর জবাব হলো—তখন কসমকারী ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ্‌র সামনে থাকে কিন্তু আল্লাহ্ তো তার সামনে হাযির থাকেন না (অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে সে হাযির জ্ঞান করে না)।

আমার কথার উদ্দেশ্য হলো—হুযূর (সা)-এর সামনে কসম খাওয়া আল্লাহকে সামনে হাযির মনে করে কসম খাওয়ার সমতুল্য। মোটকথা—জানা দরকার যে, قرب বা নৈকট্য দু-প্রকার। (এক) قرب حسى তথা অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়গত নৈকট্য। এটা দুই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (দুই) قرب علمى. অর্থাৎ জ্ঞানগত নৈকট্য। এটা এক পক্ষ থেকেও হতে পারে। সুতরাং এখন যে আপনারা আল্লাহ্‌র সামনে রয়েছেন এটা قرب علمى অর্থাৎ জ্ঞানগত নৈকট্যের অন্তর্ভুক্ত যে, আপনাদের কোন অবস্থাই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন নেই, সবই তিনি জানেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনাদের আল্লাহ্‌র নৈকট্য রয়েছে বলা যায় না। অন্যথায় সবই খোদার 'মুকার্‌রব' বা নৈকট্যশীল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর কিয়ামতের মাঠে আপনাদের আল্লাহ্‌র সামনে হওয়াটা উভয়পক্ষ থেকে হবে। আপনারা যেমন আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হবেন তদ্রূপ তিনিও আপনাদের সামনে উপস্থিত থাকবেন। সুতরাং কুরআনের বাণী نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (অর্থাৎ আমি তার ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী) আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্যই বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই এটা বলা হয়নি যে, তোমরাও আমার নিকটবর্তী বরং এখানে কেবল আল্লাহ্ নিকটবর্তী এ কথাই বোঝানো হয়েছে। বস্তুত এখানে মজার ব্যাপার হলো—আল্লাহ্ তো আমাদের নিকটে রয়েছেন অথচ আমরা তাঁর থেকে দূরে। কবির ভাষায় ঃ

يار نز ديك تر زمن به من است
وين عجب تركه من از وے دو رم

—বন্ধু তো আমার নিজের চেয়েও আমার নিকটে রয়েছে, অথচ কি আশ্চর্য আমি রয়েছি তার থেকে যোজন দূরে। সুতরাং হুযূর (সা)-এর সামনে মিথ্যা কসম খাওয়া কিয়ামতের ময়দানে স্বয়ং আল্লাহ্‌র সামনে মিথ্যা কসম খাওয়ার নামান্তর। যখন আপনারাও আল্লাহ্ তা'আলাকে নিজের সামনে হাযির-নাযির জ্ঞান করবেন। —মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ৯

(৪) চতুর্থ জবাব হলো—কোন কোন পাপের শাস্তি না হওয়া নেহায়েত মহান আল্লাহ্‌র কৃপা ও ক্ষমাশীলতা গুণের প্রকাশ মাত্র। যা শুনে মানুষ বুঝতে পারে যে,

আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি অসীম দয়ালু। আর দয়া ও দানের ফলে ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হওয়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম, অবাধ্য হওয়াটা অযৌক্তিক আচরণ বৈ নয়। প্রভুর দয়া-প্রাচুর্যে আনুগত্যের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক কথা। কিন্তু মনিবের এহেন দয়া লাভের পরও চাকরের পক্ষে অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী হওয়া নিঃসন্দেহে তার বিকৃত মানসিকতা ও চরিত্রহীনতার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এর ফলে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ভৃত্য প্রভুর পরম ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে থাকে। কাজেই এ বিশ্বাস পাপাচারের কারণ নয়; বরং অপরাধ প্রবণতার মূলোৎপাটনকারী। বিবেকবান লোকেরা মহান আল্লাহ্‌র এসব দান-অনুদানে আপ্লুত হয়ে পড়ে। সুতরাং ইসলামের সাথে সম্পর্ক যাদের গভীর তাদের চরিত্রে এ বৈশিষ্ট্যটাই নিবিড়ভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এখন এ বিশ্বাস সত্ত্বেও কারো মধ্যে অপরাধপ্রবণতার মনোভাব ফুটে উঠলে সেটা আকীদার প্রভাবে নয়; বরং ব্যক্তির বক্রবুদ্ধির লক্ষণ। যেমন বাদশার উদারতা ও দয়ার প্রভাবে সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি অধিক অনুরাগী হয়ে থাকে, যদিও বিকৃত ও দুষ্টমতি লোকেরা এর ফলে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। তাহলে এর জন্য দায়ী কি বাদশার দয়া, না তাদের বিকৃত মানসিকতা ? বিবেকবানদের হাতে এর মীমাংসার ভার ছেড়ে দেয়া হলো। কেউ কেউ

لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا –

—(আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।) আয়াতের সঠিক মর্ম উদ্ধারে সক্ষম না হয়ে ধোঁকায় পড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। কেননা আয়াতে لمن يشاء (যাকে ইচ্ছা) শর্ত না থাকায় তারা ধারণা করে নিয়েছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত যে, প্রথমত এ আয়াত ব্যাপক অর্থবোধক নয়; বরং সে সব লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী বটে, কিন্তু কুফরী অবস্থায় মারাত্মক পাপাচারে লিপ্ত ছিল। এখন পরিণাম কি হবে, ইসলাম গ্রহণের পরও কি সেসবের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, নাকি হবে না ? যদি জিজ্ঞাসাবাদই হলো তাহলে ইসলাম দ্বারা কি উপকার সাধিত হলো ? এসব চিন্তার কারণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল যে, মুসলমান হবে কি হবে না। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কাফিররা হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলো ঃ

لو اسلمنا فما يفعل بذنوبنا التى اسلفنا او كما قالوا –

—আমরা মুসলমান হলে আমাদের পূর্বকৃত গুনাহ্ সম্পর্কে কি ফয়সালা হবে ?
অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে তাদের অভয় দেয়া হয় যে, ইসলামের পূর্বে

কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তাই বোঝা গেল আয়াতের মর্মানুযায়ী ক্ষমা হবে ঠিকই কিন্তু তা ব্যাপক হারে নয়। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, অন্যদের গুনাহ্ শাস্তি ছাড়া মাফই করা হবে না। বস্তুত ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ক্ষমা তাদেরও হবে, তবে সেই শর্তে ويغفر مادون ذالك لمن يشاء [অর্থাৎ আল্লাহ্ এ ছাড়া (কুফর ও শিরক) অন্যান্য গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন যাকে ইচ্ছা।]

আয়াত শর্তসহ বর্ণিত হয়েছে। এতে নিশ্চিত ওয়াদার উল্লেখ নেই; বরং مشيت তথা 'ইচ্ছার' শর্তে শর্তায়িত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে শর্তবিহীন ক্ষমার ওয়াদা কেবল নও-মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাদের ইসলাম-পূর্ব ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহ্ অবশ্যই ক্ষমার যোগ্য। আয়াতের শানে নুযুল এ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। আর শানে নুযুল (অবতরণকালীন প্রেক্ষাপট) তাফসীরের পর্যায়ভুক্ত। এমনি বহুতর نص বা আয়াত দৃশ্যত ব্যাপক অর্থবোধক মনে হয়। কিন্তু শানে নুযুলের প্রেক্ষাপটে সেগুলো সীমিত ও গণ্ডিভুক্ত হয়ে যায়। —মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ৮

প্রশ্ন ঃ ১৮. মুসলমানদের পশু জবাই করা নিষ্ঠুরতার শামিল।

উত্তর ঃ মুসলমানদের প্রতি বিধর্মীদের প্রশ্ন—"এরা কি নিষ্ঠুর-নির্দয়, পশুর গলায় ছুরি চালাতে এদের পরাণে এতটুকু বাধে না"—নিছক অজ্ঞতা অথবা বিদ্বেষপ্রসূত উক্তি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—তাদের যত ওযর-আপত্তি তা শুধু গরু কোরবানীর বেলায়—ইঁদুর, বকরী, মুরগী, কবুতর ইত্যাদির ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। মনে হয় এর মধ্যে কোন কিন্তু আছে। বস্তুত এ সন্দেহ তাদের মায়া-মমতার ভিত্তিতে নয়, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ও ধর্মীয় গোঁড়ামিই এর অন্তর্নিহিত কারণ। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ পাশ কাটিয়ে যদি সকল পশু সম্পর্কে এ অভিযোগ উত্থাপন করেন তা হলে তার জবাব হবে, মুসলমানের অন্তর শক্ত কি নরম এ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা কতটুকু ? তাদের এ অভিযোগ যদি সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট নাও হয় তবু অন্তত অজ্ঞতাপ্রসূত তো বটেই। এ অভিযোগের প্রত্যুত্তরে তর্কশাস্ত্রবিদ আলেমগণ বিভিন্ন ভঙ্গিতে, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছেন। যাতে তর্কশাস্ত্রবিদ আলেমদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার কোন আপাতঃসুযোগ থাকতে পারে না। কেননা এ পর্যায়ে বিষয়বস্তুর বৈধতা যাচাই করা উদ্দেশ্য থাকে না বরং এ পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষকে লা-জবাব করে দেয়াই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অবশ্য যেখানে বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য যাচাই এবং যথার্থ পর্যালোচনা করা উদ্দেশ্য হয় সেখানে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিষয়টির সঠিক মর্ম 'এল্‌কা' বা প্রকাশ ঘটানো হয়। সুতরাং আল্‌হামদুলিল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার মনে এর জবাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে,

মুসলমানদের অন্তর যে দয়াহীন-নিষ্ঠুর তাদের এ অনুভূতির ভিত্তি কি ? জবাই করার কালে মুসলমানদের প্রাণে ব্যথা লাগে কি লাগে না তলিয়ে দেখুন। সমসাময়িক কোন বুযুর্গের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে—জবাই করার সময় তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে যেত। কোন্ কারণে—কিসের টানে এমন হলো ? মায়া-দয়া তা হলে আর কোন্ জিনিসের নাম। কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুসলমানদের ইনসাফপূর্ণ আচরণ একদেশদর্শী বা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হচ্ছে ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ –

—এমনিভাবে তোমাদেরকে আমি এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য হবেন সাক্ষীস্বরূপ।

এখানে وسط অর্থ ইনসাফ ও মধ্যপন্থা অর্থাৎ শক্তি ও কর্ম উভয়টার মধ্যে যেন সমন্বয় সাধন করা হয়। বিষয়টা এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, যেমন দুঃসাহস ও কাপুরুষতার মধ্যবর্তী বীরত্ব, তদ্রূপ কামুকতা এবং পাপাচারের মধ্যবর্তী সচ্চরিত্রতা। অতএব বীরত্ব ও সচ্চরিত্রতার সমষ্টি হলো আদল, ইনসাফ তথা ন্যায়নিষ্ঠতা। সুতরাং কুরআনের মর্মানুযায়ী উম্মতে মুসলিমা এমনি উম্মতে আদেলা বা ন্যায়নিষ্ঠ জাতি। কাজেই খোদায়ী বিধান এমন ছাঁচে প্রণয়ন করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে আদলের পরিমাণ যদি কমও থাকে তবু যেন সেগুলো কার্যকর করা বৈধ হয়। বাড়াবাড়ি এমন যেন না হয় যে, নির্দয়ভাবে ছুরি চালিয়ে দেয়া হলো অথবা জীব হত্যা মহাপাপের নামে একেবারে হাত থেকে ছুরিই ফেলে দিলো। মোটকথা আয়াতের মর্মার্থ হলো, এতদুভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করো। তাই আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো, অন্তরে দয়াও আছে আবার ছুরিও চালাই। কিন্তু কবির ভাষায় ঃ انكه جان بخشد اگر نبخشد رواست সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ মৃত্যু ঘটালে আপত্তির কি আছে ? কেউ যদি প্রশ্ন করে তিনি তো মারেন নাই ? কবিতার দ্বিতীয় ছন্দে এর জবাব লক্ষ করা যায় نائب ست اود ست اود ست خداست (মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি, মানুষের হাত খোদারই হাত)। এটা স্বীকৃত কথা যে, প্রাণের মালিক যিনি ইচ্ছা হলে তা ফিরিয়ে নেয়া তাঁরই অধিকার। আমরা তাঁরই প্রতিনিধি, আদেশ দিয়েছেন, তাই ছুরিকা চালাই। বস্তুত প্রাণীর জীবন আমরা হরণ করছি না, আমরা তো কেবল দেহ-পিঞ্জর থেকে প্রাণবায়ু বের হওয়ার পথ করে দিয়েছি মাত্র। তাহলে মুসলমানদের নির্দয় হওয়ার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে আর আপনারা বড় দয়ালু! নিজেরা তো ইঁদুর পর্যন্ত মারতে নারাজ, দরকার হলে

মুসলমান মহল্লায় এনে ছেড়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য—তারা মারুক। তাহলে আপনারা চিকা মারার জন্য যে ক্ষেত্রে আমাদেরকে উকিল বানিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ গরু জবাই করার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে প্রতিনিধি নিয়োগ করলে দোষের কি আছে। বস্তুত আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বে তো সুবিধাও রয়েছে যে, মারো আর খাও। আর আপনাদের প্রতিনিধিত্বের ফল হলো এই যে, মারো আর ফেলে দাও। সুবহানাল্লাহ! দয়ার কি নমুনা যে, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তাই তোমরাই সাফ করো। ওকালতী আর বলে কাকে ? এটা তো মুখের কথারও বাড়া, মুখে পরিষ্কার বললে এ আবদার রক্ষা করা কোন মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কারণ নিজের কাজ-কারবার ফেলে কে এমন দায়ে ঠেকেছে যে, তোমাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইঁদুর মারা অভিযান করে বেড়াবে। তাই তোমরা আমাদের দুয়ারে ছুঁড়ে দিলে। ভাবখানা এই—হাতের নাগালে তুলে দিলাম, চলো এবার নিশ্চিন্তে মারতে থাকো। এটা এমনই দয়া যে, এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল বড় লজ্জাহীন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার স্বামী কোথায় ? লজ্জার খাতিরে মুখে বলতে বাধল অথচ না বললেও চলে না, তাই তার সামনেই কাপড় তুলে প্রস্রাব করল অতঃপর তা ডিঙ্গিয়ে গেল। এর অর্থ হলো, নদীর ওপার গেছে। কাজেই বন্ধুগণ! কোন কোন দয়া এমনই হয়ে থাকে। এর আরো একটা উপমা দেয়া যাক। এক ব্যক্তি যিনা করার ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে যায়। সমাজে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা তাকে বলল, হতভাগা, 'আযল' করলি না কেন ? (বীর্যপাতের পূর্বে লিঙ্গ বিযুক্তিকে 'আযল' বলা হয়।) উত্তরে সে বলল ঃ শুনেছি 'আযল' করা নাকি মাকরূহ। হতভাগা, পাপিষ্ঠ! যিনা করা কবে ফরয শুনেছিলি ? কারো কারো পরহেযগারী এ ধরনের হয়ে থাকে। কাজেই আপত্তিকারীদের দয়া উক্ত স্ত্রীলোকের শরমের সাথে তুলনীয় যে, মুখে বলতে তো লজ্জায় দিশেহারা অথচ পরপুরুষের সামনে কাপড় উল্টে নেংটা হয়ে বসতে শরমে বাধল না। আর সে মুখে কিনা মুসলমানদের উপর আপত্তি ? বন্ধুগণ! আল্লাহ্র কসম খেয়ে আমি বলতে পারি, মুসলমানদের ন্যায় মায়া-মমতা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। বাস্তবেই এটা প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবির কয়েকটি ছন্দ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

دیکر قسم کھے کہ تو میرا لھو پیئے

گرپی نہ جائے جلد سے پیالہ شراب کا

اس وقت ھم سلام کرین قبلہ آپکو

گر کچہ بھی خوف کیجئے روز حساب کا

اور امتحان بغیر تویه آپکا غلام

عامل نهین هے قبله کسی شیخ و شاب کا

—কসম দিয়ে সে বলল ঃ তুমি শীঘ্র যদি শরাবের পেয়ালা পান না কর, তবে যেন আমার রক্ত পান করছ। কিন্তু হুযুর! আমরা আপনাকে ভক্তি ও সালাম তখনি করব যদি আপনার অন্তরে হিসাবের দিন তথা কিয়ামতের কিছু ভয়-ভীতি জাগ্রত থাকে। আর আপনি যাই হোন না কেন পরীক্ষা ব্যতীত আমরা কারো কথা মানতে রাযী নই।

সুতরাং বাস্তবের ঘটনাপ্রবাহ এ সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দয়ার ক্ষেত্রে দয়া করা, মায়া দেখানো একমাত্র মুসলমানদেরই বৈশিষ্ট্য। কোন জাতিই মুসলমানদের ন্যায় দয়ার্দ্রচিত্ত নয়। একবার আমার নিকট জনৈক ব্রাহ্মণের একটি পত্র আসে। সারমর্ম ছিল—মুসলমানদের ওপর অপবাদ দেয়া হয় যে, গরু ইত্যাদি জবাই করে তারা জীব হত্যা করে থাকে। কিন্তু আমার মতে তারা কোন জুলুম-অন্যায় তো করে না। অথচ প্রশ্নকর্তার নিজ সম্প্রদায় এ অত্যাচার করে থাকে। উক্ত ব্রাহ্মণের বক্তব্য উল্লেখ করার আমার উদ্দেশ্য হলো—কবির ভাষায় ঃ

الحق ما شهدت به الا عداء –

—সত্যের বাণী দুশমনের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়।

বস্তুত মাথায় চড়ে বলার নামই তো জাদু। মুসলমানরা বড় দয়ালু ও বিনম্র মনের অধিকারী। সাক্ষী হিসেবে এর ওপর কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করা হলো। সুতরাং তাদের মায়া-দয়া এর দ্বারাই প্রমাণ হয়ে যায়। —রূহুল আজ্জ ওয়াস্‌সাজ্জ, পৃ. ১৫

প্রশ্ন ঃ ১৯. জবাই করলে যদি সহজে প্রাণ বের হয়ে যায়, তবে মানুষকেও জবাই করে দেয়া উচিত।

উত্তর ঃ এ কথা জোর দিয়ে এবং দাবি করে বলা যায় যে, ইসলামী শরীয়তের তুলনায় অধিক দয়া অন্য কোন ধর্মে বর্তমান নাই। আর পশুকে জবাই করাটা দয়ার পরিপন্থী নয়। বরং পশুর বেলায় নিজে নিজে মরার চেয়ে ছুরির নিচে প্রাণ দেয়া অধিকতর আরামদায়ক। কেননা এতে কষ্ট কম হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে—যদি তাই হয় তবে তো মানুষকেও জবাই করে দেয়া উচিত, যেন আরামে মরতে পারে। এর জবাব হলো—অন্তিম মুহূর্তের পূর্বে জবাই করা জেনেশুনে হত্যা করারই শামিল। আর সে মুহূর্তের পরিচয় জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা এমনও দেখা গেছে যে, কোন মরণোন্মুখ ব্যক্তি পুনরায় সুস্থ হয়ে ওঠে। এখন প্রাণীর বেলায় কথা থাকতে

পারে যে, এদের অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষাও তো করা হয় না ? এর উত্তর হলো—জীব-জন্তু এবং মানুষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই যে, মানব জীবন সংরক্ষণ করাই মূল লক্ষ্য। কারণ মানুষের কল্যাণেই জগতের সৃষ্টি। ফেরেশ্‌তা ও জগতের অন্যান্য বস্তু বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ আনুষঙ্গিক সবকিছুর অস্তিত্বের পরেই আসল উদ্দিষ্ট বস্তুটি সৃষ্ট বা উপস্থিত হয়ে থাকে। তাই মানুষকে হত্যা কিংবা জবাই করার হুকুম দেয়া হয়নি। নতুবা বহু লোক এমতাবস্থায় হত্যা করে ফেলার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। অথচ তাদের আরোগ্যের আশা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। কেননা হত্যাকারীদের বিবেচনায় হয়ত এটাই তার অন্তিম মুহূর্ত।

পক্ষান্তরে পশুর জীবন কাম্য না হওয়ায় একে জবাই করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। একে তো এতেই এদের শান্তি, দ্বিতীয়ত এদের গোশত মানব দেহের জন্য উপকারী খাদ্য, যে মানব জীবনের সংরক্ষণই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জবাই ছাড়া স্বাভাবিক নিয়মে "জীব-জন্তু" মরতে থাকলে এদের পচা গোশতের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিল, যার ব্যবহার মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর হতো। কিন্তু কিসাস ও জিহাদের ময়দানে ব্যক্তির বিনাশ দ্বারা সমষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। কাজেই এই ক্ষেত্রে হত্যার মাধ্যমে প্রাণ সংহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও হুকুম রয়েছে যে, অপেক্ষাকৃত সম্ভাব্য সহজ পন্থায় যেন হত্যাকাণ্ড কার্যকর করা হয়। অর্থাৎ এখতিয়ারী হত্যা তথা কিসাসের ক্ষেত্রে তরবারি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে কিন্তু জিহাদের ময়দানে আকস্মিক হত্যাকালে মুস্‌লা (হাত-পা, নাক-কান ইত্যাদি কর্তন) করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। —এফনাউল মাহবুব, পৃ. ৫

প্রশ্ন ঃ ২০. মুর্দাকে দাফন করাতে পরিবেশ দূষিত হয়ে যায়, তাই পুড়িয়ে ফেলাই উত্তম।

উত্তর ঃ ইসলামী শরীয়তে মরা পোড়ানো নিষিদ্ধ করে লাশ দাফনের হুকুম দেয়ার মধ্যে ইসলামের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। কেননা দাফন করার মধ্যে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রমাণিত হয়, কিন্তু পুড়িয়ে ফেলা শরীয়তের মূলনীতি পরিহার করারই নামান্তর। কোন কোন দার্শনিক পোড়ানোর উপকারিতা ব্যাখ্যা করে এবং মুর্দাকে কবরস্থ করার বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন ঃ এতে মাটি দূষিত হয়ে যায় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় উত্থিত বাষ্প পর্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ে। এ জাতীয় যুক্তির মাধ্যমে তারা মৃত ব্যক্তিকে পোড়ানোর স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়াস চালায়। অথচ বাস্তবে আমরা এর বিপরীত অবস্থাই প্রত্যক্ষ করে থাকি। আজ পর্যন্ত কোন গোরস্থান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে দেখা যায়নি। পক্ষান্তরে চিতাখোলায় মানুষ পোড়ার দুর্গন্ধে দম

বন্ধ হওয়ার উপক্রম এবং নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার যোগাড়। সব কাজের পিছনে একটা যুক্তি দাঁড় করানো যায় যদিও সেটা অসার-অর্থহীন হোক। কিন্তু সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিজেই অনুধাবন করতে সক্ষম। বস্তুত দাফন করাটা বাস্তব ও বিবেকসম্মত বিষয় এতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কেননা এ শরীরকে যেন তার মূল সত্তায় ফিরিয়ে দেয়া হলো। মৃত্তিকা যে দেহের মূল উপাদা এর প্রমাণ হলো, আপন সত্তার প্রতি প্রত্যেক বস্তুর আকর্ষণ রয়েছে। কোন ব্যা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে ওপরের দিকে ওঠতে পারলে প্রমাণ হতো যে, মান দেহের উপাদানে আগুন কিংবা বায়ুর প্রাধান্য রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নদী-নালায় ডু তলিয়ে না গেলে বোঝা যেত তাতে পানির অংশ বেশি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ই থাকলেও মানুষ না শূন্যে ওঠতে পারে আর না পানিতে ভাসতে সক্ষম। সুতরাং এ বোঝা যায় মানবদেহের সৃষ্টিগত উপাদানে মাটির প্রাধান্য অধিক পরিমাণে রয়েছে যুক্তিসঙ্গত প্রবাদ রয়েছে—كل شئ يرجع الى اصله "প্রত্যেক বস্তুই তার মূল সত্তা দিকে ফিরে যায়।" কাজেই মৃত্তিকা বক্ষে মৃতদেহ দাফন করাটাই মূলত যুক্তিযু কথা। এর বাইরে যা কিছু আছে সবই স্বভাব ও জ্ঞানের পরিপন্থী। মরা পোড়ার অবৈধ প্রথা কিরূপে শুরু হলো—এটা এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। সুতরাং এ প্রসে কোন বুযুর্গ বলেছেন ঃ দৃশ্যত মনে হয় এ মতবাদে বিশ্বাসীদের প্রাচীন ইতিহাসে তাদের অবতার ও দেবতাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও জীবনাচরণের উপাখ্যান বর্ণি ছিল। সম্ভবত তারা ছিল জিন জাতিভুক্ত, যাদের শরীয়ত মানুষের শরীয়ত থেকে পৃথ ও ভিন্নতর জিনিস। কাজেই অগ্নি প্রধান উপাদানে সৃষ্ট জিন দেহের স্বাভাবিক ও সঙ্গ দাবি এই ছিল যে, মৃত্যুর পর তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে আপন সত্তা তথা অনলে মিশিয়ে দেয়া। এ জাতীয় অজ্ঞতা থেকে আল্লাহ পাক রক্ষা করুন! পরবর্তীতে এ প্রথাকেই পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সুন্নত মনে করে নিজেরাও তারা এর ওপর আমল করতে শুরু করে। কবির ভাষায় ঃ

چون ندید ند حقیقت ره افسانه زدند

(অর্থাৎ মানুষ যখন সত্য পথ ভুলে যায় তখন মনগড়া অলীক কাহিনী গড়তে থাকে।) এ কথা যদিও ইতিহাস সমর্থিত নয় কিন্তু এর প্রতি আনুষঙ্গিক ঘটনা প্রবাহের সমর্থ ও ইঙ্গিত রয়েছে। —রূহুল আজ্জ ওয়াস্‌সাজ্জ, পৃ. ১২

দ্বিতীয় ভাগ

রাফেযীদের বিভিন্ন সংশয়, সন্দেহ ও অভিযোগের ইসলামসম্মত সমাধান

আশরাফুল জওয়াব

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ

রাফেযীদের বিভিন্ন সংশয়, সন্দেহ ও অভিযোগের ইসলামসম্মত সমাধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রশ্ন ঃ ১. অন্তিমকালে মহানবী (সা)-এর দোয়াত-কলম চাওয়ার প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা)-এর মন্তব্য—'এর কি প্রয়োজন।'

উত্তর ঃ (এক) এ অভিযোগ মূলত হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে নয় বরং এর দ্বারা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর ওপর সত্য গোপন রাখার অভিযোগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, বাস্তবে তাঁর ওপর এ জাতীয় কোন নির্দেশ যদি থেকেই থাকে, তবে তা তিনি প্রকাশ করলেন না কেন ? অথচ আল্লাহ্‌র হুকুম প্রচার করা তাঁর ওপর ফরয ছিল। এর পরও যেহেতু আরো কয়েকদিন তিনি জীবিত ছিলেন, কাজেই কোন কারণে সে মুহূর্তে দোয়াত-কলম যোগাড় করা যদি সম্ভব নাও হয়, অন্য সময় সংগ্রহ করে তা লিখিয়ে দেয়াতে তাঁর তেমন অসুবিধে তো থাকার কথা নয়। কেননা এ ঘটনা বৃহস্পতিবারের অথচ তাঁর ইন্‌তিকাল হয়েছে পরের সোমবার। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা)-এর প্রতি নতুন কোন নির্দেশ ছিল না, বরং এটা ছিল পূর্বোক্ত কোন হুকুমেরই তাকীদপূর্ণ পুনরুক্তি মাত্র।

(দুই) হযরত উমর (রা) যেহেতু আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই মহানবী (সা)-কে এই মুহূর্তে কষ্ট দেয়াটা তিনি সমীচীন মনে করেন নি। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। যেমন চিকিৎসক কোন রোগীকে প্রথমে মৌখিক ব্যবস্থা বলে দিল। অতঃপর সদয় হয়ে তাকে বলল, দোয়াত-কলম নিয়ে এসো লিখে দেই। কিন্তু এতে চিকিৎসকের কষ্ট বিবেচনা করে রোগী নিজেই বলল ঃ থাক, কি প্রয়োজন, এ সময় আপনাকে কষ্ট দেয়া ঠিক নয়।

এ অভিযোগের একটা পাল্টা জবাব এও হতে পারে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে হযরত আলী (রা) চুক্তিপত্রে লিখেছিলেন—

هذا ما قضى عليه محمد رسول الله

—"এটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিনামা।" এতে প্রতিপক্ষ কাফের প্রতিনিধি আপত্তি তুলল যে, "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ" লিখুন। কেননা বিবাদের মূল তো এখানেই। আমরা যদি তাঁর রেসালতই স্বীকার করে নিলাম তাহলে ঝগড়া কিসের? নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন ঃ এ অংশটুকু কেটে দাও। তিনি অস্বীকার করলেন। সুতরাং এ জাতীয় বিরোধিতা তো এখানেও লক্ষ করা যায়, যেমনটি করেছিলেন উমর (রা)। অতঃপর তিনি [মাওঃ থানবী (র)] বললেন ঃ তর্কের খাতিরে তখন যদিও বলে দিয়েছি নতুবা এ ধরনের পাল্টা জবাব আমার মনঃপূত নয়। —মুজাদালাতে মা'দিলাত, প্রথম খণ্ড, দাওয়াতে আবদিয়ত, পৃ. ২৩৩

প্রশ্ন ঃ ২. 'হযরত আলী (রা)-কেই প্রথম খলিফা নির্বাচন করা উচিত ছিল' —এ সন্দেহের অবসান।

উত্তর ঃ (এক). আমাদের কোন কোন সরলমনা বন্ধু তর্ক জুড়ে দেয় যে, আলী (রা)-কে উপেক্ষা করে শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) নিজেরাই খলিফার পদ দখল করে নিয়েছিলেন। আমি বলতে চাই এর জন্য শায়খাইনের উদ্দেশ্যে দু'আ করুন। কেননা প্রথম থেকেই যদি হযরত আলী (রা)-কে খিলাফতের গুরু দায়িত্বে বসিয়ে দেয়া হতো আর সুদীর্ঘকাল তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন, তাহলে এটা ছিল তাঁর দুর্ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়ারই নামান্তর, যা সহ্য করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। আর পার্থিব স্বার্থের মোহে নয়, বরং দীনের খাতিরে তাঁদের কষ্ট-বিড়ম্বনা সর্বজনবিদিত। তাই দয়াপরবশ হয়ে তাঁরা নিজেরা সে বিড়ম্বনার অংশ ভাগ করে নিয়েছেন তবু হযরত আলী (রা)-কে বিপদের কবলে ঠেলে দেননি। অবশ্য সাহাবীগণের পারস্পরিক মনোমালিন্য বেশির ভাগই ভ্রান্তিপূর্ণ প্রচারণা মাত্র। দ্বিতীয়ত পারস্পরিক ভালবাসা ও মিল-মহব্বতের ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর মনোমালিন্য হয়েই থাকে। মাওলানা গাংগুহী (র) পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু এমন দুজন খাদেমকে একবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের দু-জনের মধ্যে কখনো কলহ-বিবাদও কি হয়ে থাকে? তারা আরয করল—হুযূর! সময় সময় এমনটি হয়ে থাকে বটে, কিন্তু পরে মিটমাট হয়ে আবার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। এ সম্পর্কে কবি যওক বলেন ঃ

بے محبت نہی ائے زوق شکایت کے مزے

بے شکایت نہی ائے زوق محبت کے مزے

—হে যওক! প্রীতির বন্ধন ব্যতীত অভিযোগের স্বাদ মিলে না আর অভিযোগ ছাড়া প্রেমের স্বাদ পাওয়া যায় না।

জনৈক আরব পণ্ডিত লেখেন ঃ

ويبقى الود ما يبقى العتاب

—"প্রীতির বন্ধন ততক্ষণই অটুট থাকে অভিযোগ যে পর্যন্ত স্থায়ী হয়।" এর কারণ হলো—অন্তরে মনোমালিন্য ও কালিমা না থাকা পর্যন্তই ভালবাসা টিকে থাকে। বন্ধুর বিরুদ্ধে অনুযোগ থাকলে প্রকাশ না করে মনে মনে তা পোষণ করতে থাকাতে আজীবন মনের কালিমা দূর হওয়ার উপায় থাকে না। তাই মনের বহিঃভাব প্রকাশ করার মাধ্যমেই কেবল অন্তরে নির্মলতা অর্জন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। সময় সময় তিনি অভিমান করে বসতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন ঃ তোমার খুশি কিংবা অসন্তুষ্টি আমি লক্ষণেই ধরতে পারি। অসন্তুষ্টিকালে কসমের মধ্যে তুমি বলে থাক لا و رب ابراهيم (না, ইবরাহীমের রবের কসম) আর খুশির সময় তোমার মন্তব্য হয় لا و رب محمد (না, মুহাম্মদের রবের কসম)। হযরত আয়েশা (রা) নিবেদন করলেন ঃ هل اهجر الا اسمك (তখন আপনার নামটাই কেবল মুখে আনি না, নতুবা অন্তরে তো একমাত্র আপনার কথাই বিরাজমান)। সুতরাং তাঁদের পরস্পর কোন কথা কাটাকাটি যদি হয়েও থাকে তবে সেটা তাঁদের পারস্পরিক মান-অভিমানের ব্যাপার, তাতে আপত্তি তোলা আমাদের মুখে শোভা পায় না। কানপুরস্থ জনৈক ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করত। ঘটনাচক্রে তার সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি একই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করলেন। স্বীয় মতের স্বপক্ষে ঃ من سب اصحابى فقد سبنى ومن سبنى فقد سب الله (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গালি দিল সে আমাকেই গালি দিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে গালি দেয় প্রকারান্তরে তা আল্লাহ্কে গালি দেওয়ারই শামিল) হাদীস উদ্ধৃত করে বললেন ঃ মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি আলী (রা) সম্পর্কে অশোভন উক্তি করতেন। কাজেই তিনি এ হাদীসের আওতায় এসে যান। আমি বললাম ঃ জনাব! আপনি চিন্তা করেন নি যে, হাদীসের যে অর্থ আপনি অনুধাবন করেছেন আসলে সেটা ঠিক নয়। বরং হাদীসের মর্ম ভিন্ন রকম। উক্ত হাদীসের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে আপনাকে বাকরীতির সাথে পরিচিত হতে হবে। কেউ যদি বলে—যে ব্যক্তি আমার ছেলের প্রতি

চোখ তুলে তাকাবে তার চোখ আমি উপড়িয়ে ফেলবো। এখন বলুন—এ ধমকী কার বিরুদ্ধে ? নিজের অন্যান্য সন্তানের ওপরও কি এটা বর্তাবে যে, তারা পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হলে তাদের সাথেও এহেন আচরণ করা হবে নাকি অনাত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ?

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ হুমকি পরের বেলায়। সুতরাং হাদীসের মর্মও তাই যে, কোন অসাহাবী আমার কোন সাহাবী সম্পর্কে এ জাতীয় মন্দোক্তি উচ্চারণ করলে তার সাথে এ আচরণ করা হবে। —ফাযায়েলুল খাশিয়া, পৃষ্ঠা ৩৬

(দুই) আমি কসম করে বলতে পারি, আলী (রা)-এর অন্তরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি শায়খাইনের কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করবেন যে, তাঁকে বরং বিপদ থেকে উদ্ধারই করা হয়েছে। কেননা সাহাবীগণের খিলাফত আওধ—রাজদের রাজত্ব ছিল না যে, দিন-রাত আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে দেবেন। তাঁদের খিলাফতের চরিত্র তো এই ছিল যে, প্রচণ্ড গরমে লু-হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এমনি এক দুপুরে খলিফা উমর (রা) একা মরুপ্রান্তরে রওয়ানা হন। দূর থেকে লক্ষ করে উসমান (রা) চিনে ফেলেন যে, তিনি খলিফা উমর (রা)। তাঁর বাসভবনের নিকটবর্তী পৌঁছলে আওয়াজ দিলেন—আমীরুল মু'মিনীন! এই প্রচণ্ড গরম ও মরুর লু'য়ের তীব্র দাবদাহে যাচ্ছেন কোথায় ? তিনি বললেন ঃ বাইতুলমালের উট হারিয়ে গেছে তারই খোঁজে। উসমান (রা) বললেন ঃ কোন খাদেমকে পাঠিয়ে দিলেই হতো। খলিফা উমর (রা) উত্তরে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রশ্ন তো করা হবে আমাকে, খাদেমকে নয়। হযরত উসমান (রা) আরয করলেন ঃ তাহলে একটু অপেক্ষা করে যান, তাপের মাত্রা কমে আসুক। জবাবে হযরত উমর (রা) نار جهنم اشد حرا —"জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও প্রচণ্ড"—উক্তি করে সেই তীব্র রোদ ও লু-হাওয়া উপেক্ষা করে ময়দানে বেরিয়ে পড়লেন। এই ছিল তাঁদের রাজত্ব ও খিলাফতের নমুনা।

হযরত উমর (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে একবার খুতবা দিচ্ছেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বললেন ঃ اسمعوا واطيعوا (অর্থাৎ তোমরা শোন এবং আনুগত্য কর)। শ্রোতাদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ لا نسمع ولا نطيع (আমরা শুনবও না, আনুগত্যও করব না)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন ? প্রশ্নকর্তা জবাবে বললেন গনীমতের মাল বণ্টনসূত্রে আমাদের সবার ভাগে পড়ল মাত্র একখণ্ড বস্ত্র, কিন্তু আপনার পরনে দেখছি দুই খণ্ড। কোথায় পেলেন, জবাব চাই। উমর (রা) বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। হে আবদুল্লাহ! তুমিই এর জবাব দাও। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ নামায পড়াবার উপযোগী কোন কাপড় আজ আমীরুল

মু'মিনীনের ছিল না। তাই আমার ভাগের টুকরাটা ধারস্বরূপ তাঁকে আমি দিয়েছি। এভাবে তাঁর দুই খণ্ড বস্ত্র হয়। এর একটিকে তিনি লুঙ্গী বানিয়েছেন অপরটিকে চাদর। উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তার চোখে পানি এসে যায়। বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, এখন আপনি খুতবা দিন, আমরা শুনব এবং আনুগত্য করব। এই ছিল তাঁদের শাসনের নমুনা। প্রজাদের যে কোন ব্যক্তি ক্ষমতাসীন খলিফার ওপর আপত্তি উত্থাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। অতএব এহেন অবস্থায় খিলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা কোন সুখের উপাদান নয়, যা কামনা করা যেতে পারে। আল্লাহ্র কসম! এর চেয়ে বিপদের জিনিস দ্বিতীয়টি হতে পারে না। কাজেই সে খিলাফত পাননি বলে হযরত আলী (রা) আদৌ মনোক্ষুণ্ণ হতে পারেন না। দ্বিতীয়ত যদি স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, খিলাফত বড়ই সুখের বস্তু, তাহলে এটাকে সে ব্যক্তি প্রত্যাশা করুক যার অন্তরে পার্থিব মোহ ও লালসা বিদ্যমান। তবে কি نعوذ بالله (আল্লাহ্ না করুন) তারা হযরত আলী (রা)-কে দুনিয়াদার সাব্যস্ত করে নিয়েছে যে, খিলাফত না পেয়ে তিনি হয়তো মনোক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবেন। ধন্য হোক তাদের এ কল্পনা-বিলাস। কিন্তু এ পর্যায়ে আমাদের বিশ্বাস তো এই যে, হযরত আলী (রা)-এর অন্তরে দুনিয়ার কোন গুরুত্ব বা কামনা আদৌ ছিল না। কেননা তিনি ছিলেন تعلق مع الله (আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক) সম্পদে সম্পদশালী—যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হলো ঃ

آں کس که ترا شناخت جاں را چه کند

فرزند و عیال و خانماں را چه کند

—যে লোক তোমার পরিচয়ে ধন্য হয়েছে নিজের প্রাণ, সন্তান, পরিজন ও বাড়ি-ঘরে তার কি প্রয়োজন ?

কাজেই খিলাফত তিনি দেরীতে পেলেন কি আদৌ পেলেন না তাতে দুঃখ হতে পারে না। বরং তিনি খুশিই ছিলেন। তাই যে কাজে তিনি খুশি তাতে আপনি দুঃখ করার কে ? এটা তো বরং "ফরিয়াদি নীরব আর সাক্ষী সরব" হওয়ার তুল্য। পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা ও মূল্যহীনতা ঘোষণা করে কুরআনে বলা হয়েছে—"সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের রকমারি চাকচিক্য বিশেষ।" (মুযাহিরুল আ'মাল, পৃষ্ঠা ১৯)

(তিন) কোন এক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় لحمك لحمي و دمك دمي অর্থাৎ তুমি-আমি রক্ত মাংসে এক ও অভিন্ন হাদীস দ্বারা হযরত আলী (রা)-এর ধারাবাহিক খিলাফত প্রমাণের প্রচেষ্টা চালায়। উক্ত হাদীস বলে তাদের যুক্তি হলো—হযরত আলী (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যেহেতু অভিন্ন সত্তায় অস্তিত্ববান কাজেই আলী (রা)-এর

বর্তমানে অপর কেউ খিলাফতের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। এর প্রথম জবাব তো এই যে, আলোচ্য হাদীস প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়ত আমি বলব, যদি একাত্মতা ও অভিন্ন সত্তার মূল্ অর্থই স্বীকৃত হয়, তবে এর দ্বারা হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের দাবিই নস্যাৎ হয়ে যায়। কারণ কেউ আপন সত্তার খলিফা হতে পারে না, খলিফা সর্বদা পর ব্যক্তি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় আলোচ্য হাদীসের প্রমাণ এতটুকুই কেবল যে, হযরত আবূ বকর (রা) যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলিফা ছিলেন তদ্রূপ হযরত আলীরও তিনি খলিফা। যদি তাই হয়, তবে তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই! কবির ভাষায় ঃ

شادم که از رقیبان دامن کشاں گذشتی
گومشت خاک ماهم برباد رفته باشی

(আমি অতিশয় আনন্দিত যে, আঁচল বাঁচিয়ে তুমি আমার প্রতিযোগীদের অতিক্রম করে পার হয়ে গেছ, যদিও তাতে আমার এক মুঠো মাটিও নষ্ট হয়েছে।) এর দ্বারা প্রতিপক্ষের দলীল তো বাতিল হলো।

অন্যান্য আলিম এর অপর এক জবাবে বলেছেন ঃ হযরত আলী (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি অভিন্ন সত্তার অধিকারী হন, তাহলে হযরত ফাতেমা (রা)-এর সাথে আলী (রা)-এর বিয়ে সিদ্ধ হয় কিরূপে ? আল্লাহ না করুন, এটা তো তাহলে হযরত হাসানাইনের (হাসান ও হুসাইন) প্রতি অশ্রাব্য-অকথ্য গালি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সত্তা অর্থ মৌলিক না হয়ে যদি রূপক ধরা হয়—যেমন সূফী সম্প্রদায় এ অর্থেই মহানবী (সা)-কে "আইনে হক" বলে থাকেন—তাহলে এটা আলী (রা)-এর কোন বৈশিষ্ট্য নয়। এহেন রূপক অর্থে প্রত্যেক সাহাবীই "আইনে রাসূল" ছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁদেরই রূহানী সম্পর্ক ছিল, এ হিসেবে কেউই পর ছিলেন না। —ইরযাউল হক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২

প্রশ্ন ঃ ৩. পবিত্র স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী (সা) দু'আ করেছেন ঃ

اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا অর্থাৎ হে আল্লাহ! প্রয়োজন অনুপাতে মুহাম্মদ-পরিবারের রিযিক দান কর। قدر قوت বলা হয়, যদ্দারা অভাব পূরণ হয় আর উদ্বৃত্ত কিছুই না থাকে। পবিত্র বিবিগণ নবী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এটা নিশ্চিত। কাজেই তাঁরাও উক্ত দু'আয় শামিল ছিলেন। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততিও এর অন্তর্ভুক্ত। আভিধানিক অর্থে বিবিগণ মুহাম্মদ-পরিবারের মূল সদস্য আর সন্তানগণ আনুষঙ্গিক।

কেননা আল্ বলা হয় পরিবার-পরিজনকে। আর স্ত্রীগণ সবার আগে এ অর্থের পর্যায়ভুক্ত। তাই এ সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না যে, সন্তানরা তো 'আলের' অন্তর্ভুক্ত আর স্ত্রীগণ বহির্ভূত। অপর এক হাদীস দৃষ্টে কারো কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, উম্মুল মু'মিনীনগণ আহ্লে শামিল নন। হাদীসটি হলো ঃ মহানবী (সা) একবার হযরত আলী, ফাতিমা ও হাসান-হুসাইন (রা) প্রমুখকে স্বীয় 'আবায়' আচ্ছাদিত করে বললেন ঃ اللهم هولاء اهل بيتى হে আল্লাহ! এরাই আমার "আহ্লে বাইত" তথা পরিবার-পরিজন। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি (!) এ হাদীসের অর্থ করেছেন—নবীপত্নীগণ আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন। অথচ হাদীসের সঠিক মর্ম হলো—হে আল্লাহ! এরাও আমার পরিবারের সদস্যভুক্ত, এদেরকেও انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا (হে, আহ্লে বাইত! আল্লাহ্ কলুষমুক্ত করে তোমাদেরকে নির্মল-নিষ্কলুষ রাখতে আগ্রহী) আয়াতোক্ত ফযীলত ও মর্যাদায় শামিল করা হোক। এখানে সীমিতকরণ উদ্দেশ্য নয় যে, এরাই কেবল আহ্লে বাইত, স্ত্রীগণ এর বাইরে। অধিকন্তু আলোচ্য হাদীসের কোন কোন সূত্রে বর্ণিত আছে—মহানবী (সা) তাঁদেরকে স্বীয় আবায় আচ্ছাদিত করে উক্ত দু'আ করার সময় উম্মে সালমা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এতে তিনি বললেন, তুমি স্বস্থানেই রয়েছ। এর অর্থ হলো এই যে, তোমাকে আবায় শামিল করার প্রয়োজন নেই, পূর্ব থেকেই তুমি আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত আলী (রা) ছিলেন উম্মে সালমা (রা)-এর জন্য পর-পুরুষ। তাই তাঁর উপস্থিতিতে উম্মে সালমা (রা)-কে আ'বার আচ্ছাদনভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। এটা তো হলো অভিযোগ ভিত্তিক জবাব। নতুবা দাবির সপক্ষে অভিধানগত দলীলই যথেষ্ট যে, আলে মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে বিবিগণ প্রথমেই শামিল রয়েছেন। দ্বিতীয়ত পবিত্র কুরআনের বাকরীতি এ ধরনেরই। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা যে, ফেরেশতা তাঁকে সন্তানের সুসংবাদ দান করলে হযরত সারা এতে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যান। এমতাবস্থায় কুরআনে ফেরেশতার মন্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ –

—ফেরেশতাগণ বললেন ঃ আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত শুনে তুমি অবাক হয়ে গেলে কি ? অথচ হে আহ্লে বাইত! আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও বরকত তোমাদের ওপর রয়েছে, তিনি অতি প্রশংসিত, মর্যাদাশীল।

বলা বাহুল্য, হযরত সারাও এখানে আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়ই। যেহেতু

সম্বোধন তাঁরই প্রতি। সুতরাং বোঝা গেল পবিত্র বিবিগণও যে আহ্‌লে বাইতের পর্যায়ভুক্ত তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। —আন্ নিস্‌ওয়ান-ফী-রামাযান, পৃষ্ঠা ৪

প্রশ্ন ঃ ৪. "কোন কোন জ্ঞান সীনা-ব-সীনা চলে আসছে" এ সন্দেহের অবসান।

উত্তর ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

سئل هل خصكم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بشئ دون الناس قال لا اله الا فهما اوتيه الرجل فى القرآن او ما فى هذه الصحيفة –

—হযরত আলী (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, মহানবী (সা) অন্য লোকদের বাদ দিয়ে আপনাকে তথা আহ্‌লে বাইতকে একক ও বিশেষ কোন কথা বলেছেন কি? তিনি বললেন, না, তবে এতটুকু যে, আল্লাহ্ কুরআনের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান হয়তো কাউকে দান করে থাকেন (তখন সে ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে যায়) অথবা এই সহীফায় উল্লিখিত বিষয় কয়টি।

অতঃপর উক্ত লিপি খুলে দেখা গেল তাতে দিয়াত বা রক্তপণ সম্পর্কিত কয়েকটি নির্দেশ বর্ণিত রয়েছে। যা কেবল হযরত আলী (রা)-এরই একক জ্ঞাত বিষয় ছিল না; বরং অন্য সাহাবীগণও এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। বস্তুত হযরত আলী (রা)-এর এ জবাবের উদ্দেশ্য ছিল—বিশেষ কোন জ্ঞান আপন সত্তায় গণ্ডিভূত জনিত সাধারণ বিশ্বাসের অস্বীকৃতি। তাতে এটাও বোঝা গেল যে, ব্যক্তিভেদে জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্য হওয়া সম্ভব। যার ফলে এক ব্যক্তি কুরআনের এমন সব জ্ঞানের অধিকারী হয় যা থেকে অন্যরা বঞ্চিত থাকে। কুরআনের সাথে হযরত আলী (রা)-এর গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে অন্যদের তুলনায় তিনি অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যে কারণে কারো কারো মনে সন্দেহ জাগে এবং সর্ব সাধারণ্যে প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্ভবত হযরত আলী (রা)-কে এককভাবে বিশেষ কোন তত্ত্ব শিখিয়ে গেছেন। তখন থেকেই এ অভিনব ধারণা সৃষ্টি হয় যে, "কোন কোন জ্ঞান বক্ষাশ্রয়ী", সিনা থেকে সিনায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। মূলত এ বিশ্বাস কুরআন-হাদীস ভিত্তিক নয়; বরং এটা 'সাবাই' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবার আবিষ্কার। যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মূলোৎপাটন করা। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল মূলে ইয়াহূদ বংশজাত। পরে সে মুসলমান হয় কপটতার আশ্রয়ে। অতঃপর হযরত আলী (রা)-এর প্রতি গভীর ভক্তি-অনুরক্তির অন্তরালে সে মুসলিম সমাজে মিথ্যা আকীদার বিষ ছড়াতে থাকে। যেহেতু তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, অস্ত্রবলে ইসলামের বিনাশ সাধন

সম্ভব নয়, তাই তারা ইসলামী বিধি-বিধানে ভ্রান্তির সংমিশ্রণের কৌশল অবলম্বন করে। আর এর জন্য উপায় আবিষ্কার করল যে, কোন কোন জ্ঞান অন্তরাশ্রয়ী। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ –

—"কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।" আল্লাহ স্বয়ং যেহেতু দীনের হিফাযতকারী, তাই ইসলামী-বিধিবিধানে কোনরূপ মিশ্রণ আসতে পারে না। অতীতে যদিও বহু পথভ্রষ্ট ফিরকা জন্ম নিয়েছে এবং বর্তমানেও এর কমতি নেই। যাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে—আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফিরকায়। উক্ত ৭৩ সংখ্যা তো মূলনীতির হিসেবে, নতুবা প্রত্যেক ফিরকার আবার রয়েছে বহু শাখা-প্রশাখা। এমনকি আজকাল প্রত্যেকেই এক একটি নির্দিষ্ট ফিরকায় পর্যবসিত। কেননা দীনের ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মত পোষণ করে থাকে। অবশ্য এর পিছনেও রহস্য আছে যে, এ ফিরকাবন্দীর কারণে কেউ যেন বিচলিত না হয়। কারণ মতবিরোধ হওয়াটা অনিবার্য, যে কোন প্রকারে এর প্রকাশ ঘটবেই। রহস্যপূর্ণ এ জগত এমনটি হতে পারে না যে, কোন বিষয় বিরোধমুক্ত থাকবে। এখন মাঝেমধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সত্যান্বেষীর মনে স্বভাবতই সন্দেহ জাগত যে, জানি না এদের মধ্যে কোন্ দল যে সত্যাশ্রয়ী। কিন্তু নিত্য দিন নতুন নতুন ফিরকার উদ্ভব হওয়ার ফলে এর দুষ্ট প্রভাব কমে আসা স্বাভাবিক। মনে মনে তারা ভাবে—বাস্তবে দেখা যায় মতবিরোধের কোন সীমা সংখ্যা নেই, যা দৈনিকের ডাল-ভাত তুল্য। কথায় কথায় কত আর সন্ধান লওয়া যায়। সুতরাং আমাদের জন্য প্রাচীন পন্থাই নিরাপদ। মোটকথা, এ ধারণা নিতান্ত ভুল যে, কোন কোন জ্ঞান অন্তরাশ্রয়ী। অবশ্য এটা ঠিক যে, এমন জ্ঞানও রয়েছে যা অর্জন করতে উচ্চতর মেধার প্রয়োজন, মধ্যম কিংবা নিম্নতর মেধা যথেষ্ট নয়। —আল-ইরতিয়াব, পৃষ্ঠা ৪

এ সম্পর্কে কেউ কেউ সূফী সম্প্রদায়কে কলংকিত করে থাকে যে, তাদের মতবাদেও অন্তরাশ্রয়ী বিশেষ জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। মূলত কুরআন ও হাদীসই তাঁদের জ্ঞানের উৎস। অবশ্য অন্তরাশ্রয়ী বলতে তাদের কাছে যা আছে সেটা হলো—আধ্যাত্মিক পথ এবং এর সাথে সম্পর্ক, যা প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে হাসিল হয়। এমনকি সুতারী ও বাবুর্চিগিরিতেও কাজের সাথে সম্পর্ক এবং দক্ষতা বলতে যা বোঝায় সেটা গভীর মনোনিবেশ আর অন্তরের আকর্ষণেরই ফল। এরই নাম অন্তরাশ্রয়ী জ্ঞান। আর এ জ্ঞান কেবল ওস্তাদের

সান্নিধ্যেই অর্জিত হতে পারে, কেবল পুস্তক পাঠ কিংবা মৌখিক নির্দেশে অর্জন করা সম্ভব নয়। সকল প্রকার পাক প্রণালী নির্দেশক "খানে নে'আমত" নামে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এখন এটা পড়েই কি কেউ দক্ষ বাবুর্চি হতে পারে ? আদৌ না। কোন দক্ষ বাবুর্চির সাহচর্যের আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ ব্যতীত এটুকুর জ্ঞান অর্জন করাও সম্ভব নয়। তাও আবার এক দু'বার দেখায় চলবে না বরং বারবার দেখতে হবে, শিখতে হবে। সুতরাং এক মহিলা গুলগুলা তৈরিকালে স্বামী এসে বলল ঃ তুমি অমুক কাজটি সেরে আস, গুলগুলা আমি বানাব। স্ত্রী বলল ঃ এটা তোমার কাজ নয়। স্বামী বলল, বলে কি, এটা আবার একটা কাজ হলো, এভাবে দিলাম আর বানিয়ে ফেললাম। ব্যস, হয়ে গেল। স্ত্রী বলল—বেশ, এখনই দেখা যাবে। অতএব স্বামী বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে উত্তপ্ত ঘিয়ে গুলগুলা ঢেলে দিল। আর গরম ঘিয়ের ছিটা পড়ে শরীর পুড়ে গেল। স্ত্রী এসে বলল—বলেছিলাম না, এটা তোমার কাজ নয়। স্বামী মনে করেছিল, এটা আবার একটা কঠিন কাজ হলো, চুলায় দিলাম আর হয়ে গেল। তদ্রূপ গংগুহের এক অতিভোজী পীর বলত, আহার করা এমন কি কঠিন কাজ, মুখে পুরে দাও আর গিলে ফেল, পথচলা আবার কঠিন হলো ? পা উঠাও আর ফেল, ব্যস হয়ে গেল। সে বেচারা দৈনিক অধিক ভোজন আর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করত। কিন্তু এ দু'টি শব্দ দ্বারাই কি কাজ হয় ? আপনি একবার করেই দেখুন না, তখন বুঝে আসবে। একইভাবে এক-দু'বার দেখেই মিস্ত্রীর কাজ করা যায় না। সুতারকে দেখে বানর মিস্ত্রীর কাজ করতে চেয়েছিল। পরিণাম কি হয়েছিল ? তাই বলা হয়—کار بوزینه نیست نجاری—বানরের কাজ মিস্ত্রীগিরি করা নয়।

মোটকথা, সূফীবাদে অন্তরাশ্রয়ী বলতে যা আছে তা হলো, অধ্যাত্ম জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক ও পারদর্শিতা। অপরটি হলো, বরকত, দিব্য চোখের দর্শন ব্যতীত যা অনুভব করা যায় না। যেমন নাবালেগ ছেলে সংগমস্বাদ উপভোগ করতে পারে না। একবার ঘটনা হলো—কয়েকজন সখী মিলিত হয়ে পরস্পর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় যে, বিয়ের স্বাদ না জানি কেমন। একজন বলল, আমার বিয়ে হোক তখন বলব। তার বিয়ে হলে সখীরা চেপে ধরল, এখন বল। সে জবাব দিল, বিয়ে এমনই জিনিস যা তোমার হলে পরে বুঝে আসবে। মোটকথা, অন্তর্লোকের বিষয়কে প্রকাশ করা যায় না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারাই কেবল সেটি অনুভব করা চলে। অনুরূপভাবে বরকতও কেবল প্রত্যক্ষ দর্শনের আশ্রয়েই অনুভবযোগ্য। অতএব যারা ধারণা পোষণ করে যে, হযরত আলী (রা) বিশেষ কোন গোপন বাণী অথবা অন্তরাশ্রয়ী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তারা মূলত শরীয়তের বিধি-বিধানে ভ্রান্তিজালের মিশ্রণ প্রয়াসী। হযরত আলী (রা)

নিজেই এ ধারণা বাতিল ঘোষণা করে বলেছেন ঃ হ্যাঁ, অন্তরাশ্রয়ী জ্ঞান থাকতে পারে, সেটা হলো—কারো পক্ষে কুরআনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। কুরআন দ্বারা এখানে খোদায়ী শরীয়ত সম্পূর্ণটাই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করল ঃ কিতাবুল্লার নির্দেশানুযায়ী আমাদের মামলা নিষ্পত্তি করে দিন। অতঃপর তিনি মহিলাকে 'রজম' আর পুরুষকে একশ দোররা এবং দেশান্তরের হুকুম দিলেন। অথচ কুরআনে রজমের হুকুম নেই। কাজেই কিতাবুল্লাহ দ্বারা এখানে ইসলামী শরীয়ত উদ্দেশ্য। কেননা আংশিক কিংবা সামগ্রিক সর্বাবস্থায় শরীয়তের বিধানাবলী কিতাবুল্লার সাথেই সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইবনে মাসউদ (রা) হাদীসের কোন কোন বিধানকে কুরআন নির্দেশিত আখ্যা দিয়ে— مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (অর্থাৎ রাসূল যা নির্দেশ করেন তাকে আঁকড়ে ধর আর যা নিষেধ করেন তা থেকে নিবৃত্ত থাক) আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এরি নাম মার্জিত ও পরিশীলিত অনুভূতি, ব্যক্তি ভেদে যার তারতম্য ঘটে থাকে। এক ব্যক্তির হাদীস জানা আছে কিন্তু এ দ্বারা কি কি মাসআলা উদ্ভাবিত হতে পারে সে অনুভূতি তার না-ও থাকতে পারে। সুতরাং কুফার জনৈক খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের সাথে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে। উক্ত মুহাদ্দিস আবূ ইউসুফ (র)-কে প্রশ্ন করেন—আপনার ওস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বিরুদ্ধাচরণ কেন করলেন ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ মাসআলায় ? মুহাদ্দিস বললেন ঃ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ফতোয়া হলো—বিক্রি করাই বাঁদীর জন্য তালাক (অর্থাৎ মনিব বিবাহিতা বাঁদী বিক্রি করে দিলেই তালাক পড়ে যাবে, স্বামীর তালাক নিষ্প্রয়োজন)। অথচ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, বিক্রি তালাকের মধ্যে গণ্য হবে না। আবূ ইউসুফ (র) বললেন ঃ আপনিই তো আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাঁদীর বিক্রয়কে তালাক সাব্যস্ত করেননি। মুহাদ্দিস বললেন ঃ আমি কবে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ আপনি আমার নিকট হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) 'বারীরা'কে খরিদ করার পর মুক্ত করে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে পূর্ব স্বামীর সাথে বিয়ে অক্ষুণ্ণ রাখা অথবা বাতিল করে দেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। তাই বাঁদীকে বিক্রি করাই যদি তালাক হয়, তাহ-লে অধিকার দেয়ার কি মানে ? মুহাদ্দিস চিন্তা করতে লাগলেন, বললেন ঃ হে আবূ ইউসুফ! এ মাসআলা সত্যি কি উক্ত হাদীসের অন্তরালে নিহিত ? বললেন—জি হ্যাঁ। মুহাদ্দিস বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আপনারা চিকিৎসক আর আমরা আতর বিক্রেতা।

বন্ধুগণ! ফকীহ্গণের বিশ্লেষণের আশ্রয়ে আমাদের পক্ষেও অনুভব করা সম্ভব হয়েছে যে, অমুক হাদীস, অমুক আয়াত থেকে এ মাসআলা উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের ব্যাখ্যা ছাড়া এটা বোঝা অতীব কঠিন ব্যাপার। এরই নাম ইজতিহাদ। এ অনুধাবন ক্ষমতাকেই আলী (রা) ব্যক্ত করেছেন—الا فهما اوتيه الرجل فى القران (কিন্তু অনুভব ক্ষমতা যা কোন ব্যক্তিকে কুরআন সম্পর্কে দান করা হয়) উক্তি দ্বারা।

বিদআতপন্থীদের জবাব

প্রশ্ন ঃ ৫. বিদআতের পরিচয় ও এর স্বরূপ কি ?

উত্তর ঃ (ক) বিদ'আতের এক পরিচয় হলো—কুরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াস—এ চার দলীলের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত নয় অথচ দীনী কাজ মনে করে তার ওপর আমল করা হয় সেটাই বিদ'আত। বিদ'আতের এ পরিচয় জানার পর উরস করা, ফাতিহা দেয়া, দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে ইসালে সওয়াবের অনুষ্ঠান পালন ইত্যাদি কোনটাই বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় অথচ দীন মনে করেই এসব আচার-অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে কি-না লক্ষ করুন। এসব ব্যাপারে খাস লোকদের আকীদা-বিশ্বাস যদিও খারাপ নয়, কিন্তু হানাফী মাযহাবে বিধান রয়েছে—শরীয়তসম্মত নয় বিশিষ্ট লোকদের এমন পছন্দনীয় আমলের প্রভাবে সাধারণের মধ্যে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশংকা দেখা দিলে তাদের পক্ষে সে কাজ বর্জন করা উচিত। অবশ্য যদি সে কাজ শরীয়তসম্মত হয় আর তাতে অনৈসলামী কোন বিষয় মিশ্রিত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজ এ থেকে মুক্ত করতে হবে, তাকে বর্জন করা চলবে না। যেমন—জানাযার মধ্যে অনৈসলামী কার্যকলাপ মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও এর সাথে গমন করা ও শোক প্রকাশ বর্জন করা যাবে না। কেননা জানাযার সাথী হওয়া, শোক প্রকাশ করা শরীয়তসম্মত বিধান। ইসালে সওয়াবে দু'টি বিষয় রয়েছে। (ক) সময় নির্দিষ্ট করা এবং (খ) ইসালে সওয়াব তথা সওয়াব পৌছানো। বৈধ হওয়া সত্ত্বেও প্রথমটি শরীয়তের কাম্য নয়। সময় নির্ধারণ দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণে এটিকে আমাদের বর্জন করতে হবে। কিন্তু গোটা জাতির আকীদায় যদি এটাকে অনিবার্যতার রূপ দেয়া না হয়, তবে সাধারণ-অসাধারণ সবাইকে এর অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিবেশে অধিকাংশের ধারণা—নির্দিষ্ট দিনে সওয়াব পৌছালে কবূল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অথচ এ বিশ্বাস শরীয়তসম্মত নয়। কাজেই এর অনুমতি কিভাবে দেয়া যাবে ? একজন আমাকে বলল, আঠার তারিখ পর্যন্ত ফাতিহা ইয়াযদহম চলতে পারে, এরপর নয়। কোন এক ওয়াযে আমি

দিলাম, যে কল্যাণ কামনায় খাদ্যের ওপর সূরা পাঠ করা হয় একই উদ্দেশ্যে কখনো টাকা কিংবা কাপড়ের ওপর পড়লেই বা অসুবিধা কি ? অথচ তা তো করা হয় না। উপরন্তু নিয়তের পরিশুদ্ধি একান্ত জরুরী। কেননা বেশির ভাগ নিয়ত এই হয় যে, আমরা তাদের প্রতি সওয়াব পৌছালে আমাদের পার্থিব উদ্দেশ্য সফল হবে।

কাজেই বন্ধুগণ! আকীদাগত ত্রুটির দিকে না তাকিয়ে এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন—কারো নিকট আপনি হাদিয়ার মিষ্টি উপস্থিত করে বললেন, ভাই সাহেব! আপনাকে আমার মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে হবে। আন্দাজ করুন সে কি পরিমাণ ব্যথিত হবে। কাজেই এর দ্বারা দুনিয়াদারদের মনে ব্যথা আসতে পারলে আল্লাহ্ওয়ালাদের অন্তর অধিক দুঃখিত হবে। বিশেষত মরণের পর সূক্ষ্মতা আরো বেড়ে যায়। কেননা মানুষ তখন দেহপিঞ্জর বিমুক্ত হয়ে নিখুঁত আত্মায় পরিণত হয় এবং তার অনুভূতি শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। অতএব আত্মা যখন বুঝতে পারে যে, এটা মতলবের হাদিয়া তখন কি পরিমাণ ব্যথিত হবে ? অধিকন্তু ওলী-আল্লাহগণের সাথে পার্থিব স্বার্থে মহব্বত ও সম্পর্ক স্থাপন অধিক লজ্জার ব্যাপার। বন্ধুগণ! এখন তাঁরা দুনিয়া কোথায় পাবেন ? তাঁদের নিকট পার্থিব উপকারের আশা করা স্বর্ণকারের নিকট লোহার জিনিস গড়ার কামনা কিংবা কোন চিকিৎসকের নিকট ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে দেয়ার বায়না ধরার সমতুল্য।

বন্ধুগণ! হযরত গাউসুল আযমের সাথে আমাদের ভক্তি-ভালবাসা এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে হিদায়েতের পথনির্দেশ করেছেন। এর প্রতিদানে সামান্য সওয়াব রিসানী দ্বারা তাঁদের আত্মাকে খুশি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ফলে আল্লাহ্ও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আমার এ বক্তব্যে আশা করি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আমরা ইসালে সাওয়াব থেকে নিষেধ করি না বরং এর অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করি মাত্র। যেদিন জনগণের আকীদা-বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করেছে মনে করব সেদিন থেকে এ নিষেধবাক্য উচ্চারণ থেকে আমরাও বিরত থাকব। কিন্তু এটা না হওয়া পর্যন্ত একে না-জায়েয আমাদের বলতেই হবে । রইল দুর্নামের কথা—আল-হামদুলিল্লাহ দীনের প্রচারকল্পে এর কোন পরোয়াই আমরা করি না। এ ব্যাপারে আমাদের নীতি বা মাযহাব হলো ঃ

ساقیا بر خیز ودر ده جام را

خاك بر سر كن غم ايام را

گرچہ بد نامیست نزد عاقلاں

مانمی خواهیم ننگ و نام را

—হে সাকী! ওঠ মদিরাপাত্র পরিবেশন কর, কুসংস্কারের ভয়ের মুখে ছিটিয়ে দাও ধূলির গুঁড়া। মানুষের নিকট এটা যদিও দুর্নামের বিষয়, কিন্তু সুনাম বা কুনাম কোনটারই আমরা পরোয়া করি না। —তাক্‌বীমুয্‌যায়গ, পৃষ্ঠা-২৯

(খ) আলোচনা চল্‌ছিল বিদ'আতের বৈধতা নিয়ে যে, কেউ যদি যোহরের ফরয নামায চার রাকাতের স্থলে পাঁচ রাকাত আদায় করে এমতাবস্থায় তার পাঁচ তো পাঁচ, চার রাকাতও আদায় হবে না। হয়তো সে যুক্তির আশ্রয় নিতে পারে—এমন কি মন্দ কাজটা করলাম ? নামাযই তো পড়েছি, তাও এক রাকাত বেশি। কিন্তু কথা তো সেটা নয়। আসল ব্যাপার হলো, সে শরীয়তের বিধান লংঘন করেছে। যেমন দুই পয়সার ডাক টিকিটের স্থলে খামের ওপর কেউ আট আনার কোর্ট ফি সেঁটে দিলে চিঠি বিয়ারিং হয়ে যায়। এখানেও সে যুক্তি খাড়া করতে পারে, দুই পয়সার স্থলে আট আনা ব্যয় করলাম তাতেও বিয়ারিং ? কিন্তু এখানেও একই কথা, সরকারের আইনের বরখেলাফ বিপথে ব্যবহারের দরুন তার টিকিট বাতিল গণ্য হবে। একই টিকিট সে যথাস্থলে আদালতে ব্যবহার করলে কাজে আসত। উক্ত পাঁচ রাকাত তদ্রূপই মনে করুন। মজার ব্যাপার হলো, উক্ত পাঁচ রাকাত বাতিল হওয়াতে কারো দ্বিধা নেই যে, সে তো সৎ কাজই করেছে ? তাহলে বাতিল হবে কেন ? অথচ বিদ'আতের ক্ষেত্রে ব্যাপার অন্যরকম। এর অবৈধতার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়া হয় না।

এক ব্যক্তি বিবরণ দিল যে, মাওলানা গাংগুহী (র) "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লার" সাথে "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" বলতে নিষেধ করেছেন। সন্ধানের পর প্রকৃত ঘটনা জানা গেল যে, আযানের শেষ বাক্য মুয়ায্‌যিনের "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র" জবাবে কোন কোন অজ্ঞ লোক "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" বলে দেয়। অথচ আযানের জবাবে আযানের শব্দ উচ্চারণ করাই হাদীসের নির্দেশ। সুতরাং শেষ বাক্য—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র পর যেহেতু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলার নির্দেশ নেই এজন্য কেবল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেই জবাব শেষ করতে হবে। এই ছিল মাওলানা গাংগুহীর নিষেধের তাৎপর্য। এটাকেই এমনভাবে বিকৃতির রং চড়ানো হয়েছে যে, তিনি কালিমার মধ্যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলতে নিষেধ করেন। (আল্লাহ মাফ করুন) আযান শরীয়তের অংশ, এটা স্পষ্ট। এর মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন বিদ'আত। তদ্রূপ শরীয়তের নিষিদ্ধ অন্যান্য বিদ'আতের অবস্থা একই ধরনের, পার্থক্যের কোন কারণ থাকতে পারে না।

—মাকালাতে হিকমত, দাওয়াতে আবদিয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭

(গ) বিদ'আত অবৈধ হওয়ার তাৎপর্য এখানেই, এতে গভীর চিন্তা করা হলে এর অবৈধতায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। নিত্যকার ঘটনাবলী লক্ষ করুন। সরকারী আইন গ্রন্থ ছাপতে গিয়ে কোন ছাপাখানা যদি শেষের দিকে একটি দফা যোগ করে দেয়, রাষ্ট্রের জন্য তা যতই কল্যাণকর হোক এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব দুনিয়ার আইন বইয়ে এক দফা যোগ করা যদি অপরাধ হয়, তবে শরীয়তের আইনে বিদ'আত নামক দফা যোগ করাটা অপরাধ হবে না কেন ? তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ গোশত খাওয়া বর্জন করলে অবশ্যই সেটা অপরাধ হবে। আল্লাহ্‌ওয়ালাদের কেউ কেউ ব্যাধিজনিত কারণে গোশত খাওয়া বর্জন করেছিলেন কেবল চিকিৎসাকল্পে শরীয়তের বিধান লঙঘনের দৃষ্টিতে নয়। পক্ষান্তরে অজ্ঞ-মূর্খরা দীন, ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে বিদ'আতের আশ্রয় নিয়ে থাকে। — ইহ্‌সানুত্‌ তাদবীর, পৃ. ১২

(ঘ) জানা দরকার—সর্বোত্তম যুগের পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত বিষয় দু-ধরনের। এক. যার আবিষ্কারের কারণ বা উপলক্ষ নতুন কিন্তু অন্যান্য আদিষ্ট বিষয়ের বাস্তবায়ন সেটার ওপর নির্ভরশীল। যেমন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী রচনা ও সংকলন, মাদ্রাসা-খানকা নির্মাণ ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুগে ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে এ সবের প্রয়োজন তীব্র হয়ে ওঠে। কথাটা একটু বিশ্লেষণসাপেক্ষ। তা এই যে, দীনের হিফাযত করা সবার দায়িত্ব এটা জানা কথা। তাহলে বুঝুন যে, উত্তম যুগে এর জন্য পরবর্তীতে উদ্ভাবিত পন্থা ও উপায়সমূহের আদৌ প্রয়োজন ছিল না। কেননা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবার জন্য নবুয়তের সাহচর্য-প্রভাবই যথেষ্ট ছিল। তাদের স্মরণশক্তি এত তীব্র ছিল যে, যা কিছু শুনতেন শিলাখণ্ডের ন্যায় হৃদয়ে সে সব অংকিত হয়ে যেত। অনুভূতি ও মেধা এত উন্নতমানের ছিল যে, তাঁদেরকে সবক আকারে পাঠদানের প্রয়োজন ছিল না। সবার মধ্যে তাকওয়া-পরহেযগারী ও আল্লাহভীতি প্রবল ছিল। এর পরবর্তী যুগে অলসতা বেড়ে যায়, স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে ভোগবাদী ও জ্ঞানপূজারীদের প্রভাবে দীনদারী আচ্ছন্ন হতে থাকে। এমতাবস্থায় সমকালীন আলিম সমাজ ইসলাম বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় শংকিত হয়ে পড়েন। আর দীনী বিষয়াদি সামগ্রিকভাবে সংকলন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকাহ্‌, উসূলে ফিকাহ্‌, আকাঈদ ইত্যাদি বিষয়ে দীনী গ্রন্থাবলী রচিত হয় এবং বিভিন্ন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। একইভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সাধারণের অনীহা দৃষ্টে পীর-মাশায়েখগণ খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ এ ছাড়া দীনের

হিফাযতের দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। অতএব উত্তম যুগে প্রয়োজন ছিল না বিধায় এসব উপায় ও পন্থা পরবর্তী যুগের অনিবার্য আবিষ্কার বটে, কিন্তু দীনের সংরক্ষণ এসবের উপর নির্ভরশীল। তাই এ কর্মপন্থা দৃশ্যত যদিও বিদ'আত পরিলক্ষিত হয় কিন্তু মূলত مقدمة الواجب واجب (অর্থাৎ ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব) নীতির প্রেক্ষাপটে এর অনিবার্যতা অনস্বীকার্য।

দুই ঃ দ্বিতীয়ত সেসব কাজ, যেগুলোর কারণ বা উপাদান পুরাতন ও প্রাচীন। যেমন প্রচলিত মিলাদ, দশমী, তীজা, চল্লিশা ইত্যাদি বিদ'আত। এগুলোর উপাদান পূর্বেই বর্তমান ছিল। যথা মিলাদ অনুষ্ঠানের কারণ ও মূল উদ্দেশ্য হলো, মহানবী (সা)-এর জন্মের দরুন আনন্দ প্রকাশ করা। এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহানবী (সা) কিংবা সাহাবীগণ কেউই এ অনুষ্ঠান পালন করেন নি। তাহলে (আল্লাহ্ না করুন) সাহাবীগণের অনুভূতি কি এ পর্যায়ের ছিল না ? নবুয়তী যুগে এর কারণ উপস্থিত না থাকলে হয়তো একটা কথা ছিল। কিন্তু এর হেতু ও ভিত্তি মৌজুদ থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিংবা সাহাবীগণ কি কারণে একটি বারও মিলাদ অনুষ্ঠান পালন করলেন না ? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উপযুক্ত কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয়নি সে কাজ আকৃতিগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে নিশ্চিত বিদ'আত যা من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه (যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত নয় এমন বিষয় সৃষ্টি করে তা অনিবার্যরূপে পরিত্যাজ্য) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে অবশ্য বর্জনীয়। আর প্রথম প্রকার ما منه (যা শরীয়তসম্মত)-এর আওতাভুক্ত হওয়ার দরুন গ্রহণযোগ্য। বিদ'আত ও সুন্নতের পরিচয় লাভের এই হলো নীতিমালা, যদ্দ্বারা এর সকল শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবিত হতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে আরো একটি আশ্চর্যরকম ব্যবধান রয়েছে। তা হলো, প্রথম প্রকার আলিম সমাজ কর্তৃক প্রস্তাবিত ও উদ্ভাবিত, এতে সাধারণ লোকের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিষয়ের প্রস্তাবক বিবেকহারা সাধারণ মানুষ আর এর পরিচালনায় তাদেরই থাকে মুখ্য ভূমিকা। সুতরাং মিলাদ শরীফের আবিষ্কারক ছিলেন জনৈক বাদশাহ, যিনি অনালিম সাধারণ লোক বৈ নন। উপরন্তু সাধারণ লোকরাই এতে যোগদানে অধিক মাত্রায় উৎসাহ প্রদর্শন করে।

—আস্‌সুরূর, পৃষ্ঠা ২৭

প্রশ্ন ঃ ৬. হকপন্থীদের ওহাবী বলা বানোয়াট কথা।

বিদ'আতীরা বলে আমরা ওহাবী। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণ আজ পর্যন্ত বুঝে আসল না। কেননা ওহাবী বলা হয় ইবনে আবদুল ওহাবের সন্তান কিংবা তাঁর

অনুসারীদেরকে। ইবনে আবদুল ওহাবের জীবনী সংকলিত রয়েছে। তা পাঠ করে প্রত্যেকেই অবগতি লাভ করতে পারে যে, তিনি আমাদের অনুকরণীয় বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত নন কিংবা আমরা তাঁর উত্তরপুরুষেও শামিল নই। অবশ্য বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদরা এক হিসেবে ওহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারে, যেহেতু তাদের অধিকাংশ আকীদা-বিশ্বাস ইবনে আবদুল ওহাবের ধ্যান-ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদেরকে বরং হানাফী বলাই সঙ্গত। কারণ শরীয়তের উসূল কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাতে রাসূল, ইজমায়ে উম্মাত এবং মুজতাহিদের কিয়াস এ চারটিতে সীমিত। এর বাইরে অপর কোন উৎস নেই। মুজতাহিদ আছেন অনেক। কিন্তু ইজমায়ে উম্মাতের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, এ চারটি মাযহাবের আওতামুক্ত অপর কোন মাযহাবের উপস্থিতি অবৈধ। অধিকন্তু এটাও স্থিরীকৃত যে, এ চার মাযহাবের মধ্য হতে বহুল প্রচলিত মাযহাবের অনুসরণ করাই বিধেয়। কাজেই এ উপমহাদেশে যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অধিক প্রচলিত তাই আমরা তাঁরই অনুসরণ করি। অবশ্য ওহাবী আখ্যা প্রাপ্তিতে আমরা বড় একটা বিষণ্ণচিত্ত নই। কিন্তু এতটুকু বলে রাখি কিয়ামতের দিন এ মিথ্যা অপবাদের জবাব অবশ্যই দিতে হবে।

—তাক্‌বীমুয্ যায়গ, পৃষ্ঠা ২৯

প্রশ্ন ঃ ৭. শায়খ আবদুল কাদের জীলানীর ফাতেহা ইয়াযদহম পালনকারীদের কর্মগত, বিশ্বাসগত ও ঐতিহাসিক ভ্রান্তি।

বর্তমানে বহুলোক গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জীলানী (র)-এর ফাতেহা ইয়াযদহম তথা মৃত্যু দিবসে প্রথাগত অনুষ্ঠান পালনে বিশেষ তৎপর। প্রথমত لا تتخذوا قبرى عيدا (আমার কবরকে তোমরা উৎসবকেন্দ্রে পরিণত করো না) হাদীস দ্বারা এর বৈধতা বাতিল হয়ে যায়। কারণ মিলাদুন্নবীর ন্যায় এ দিনটিও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেখানে অপরিবর্তনীয় জিনিস তথা মহানবী (সা)-এর কবরকে উৎসবকেন্দ্র সাব্যস্ত করা হারাম সে ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল তথা বড় পীরের একাদশীকে উৎসবে পরিণত করা জায়েয হওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে ? দ্বিতীয়ত এ তারিখেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে কোন ঐতিহাসিক এ কথা লিখেননি। আল্লাহ্ জানেন জনসাধারণ এগার তারিখের সন্ধান লাভ করল কোন্ কেরামতী সূত্রে। কেউ কেউ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে যে, গাউসুল আযম নিজে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফাতেহা ইয়াযদহম পালন করতেন।

প্রথমত এ রেওয়ায়েত প্রমাণিত নয়, এর প্রমাণ উপস্থিত করা উচিত।

দ্বিতীয়ত যদি প্রমাণিত হয়ও তবে কি তারা গাউসুল আযমকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমকক্ষ স্বীকার করে নিচ্ছে যে, মহানবী (সা)-এর ফাতেহা বাদ দিয়ে তারা বড় পীরের ফাতেহা পালন করছে। এটা তো তাদের বিশ্বাসেরও পরিপন্থী। কেননা যদি স্বীকার করে নেয়াও হয় যে, গাউসুল আযম মহানবী (সা)-এর ফাতেহা পালন করতেন তাহলেও তাঁর পক্ষে এটা সহ্য করা সম্ভব ছিল না যে, আমার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বর্জন করে আমার একাদশী তথা মৃত্যু দিবস পালন করা হোক।

তৃতীয়ত হযরত গাউসুল আযমকে রাসূলুল্লাহ্র সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়ে তাঁর মিলাদের সাথে তুলনা করে বড় পীরের ফাতেহা অনুষ্ঠানের আকীদাই মূলত ভ্রান্ত ধারণা। কোথাও কোথাও বড় পীরের মিলাদও শুরু হয়ে গেছে। তিনি যেন মহানবী (সা)-এর সমকক্ষ হয়েই গেছেন। বিপদের কারণ আরো আছে। ফাতেহাপন্থীরা বিশ্বাস করে যে, একাদশীর ফাতেহা পালিত না হলে বালা-মুসিবত নাযিল হবে। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে কোন্ অঘটন না জানি ঘটিয়ে বসেন। (আল্লাহ্ মাফ করুন) তিনি যেন মানুষকে কষ্ট দেয়ার জন্য ওঁত পেতে বসে আছেন। অধিকন্তু ফাতেহা পালন করাকে সন্তান ও সম্পদের উন্নতির কারণ মনে করা হয়। এর দ্বারা গাউসুল আযমের সাথে স্বার্থ বিজড়িত সম্পর্কই প্রমাণিত হয়। বড় লজ্জার ব্যাপার, যে মুর্দার তিনি ত্যাগ করে গেলেন সে পার্থিব স্বার্থেই তাঁর সাথে সম্পর্ক পাতানো হচ্ছে। মোটকথা, এগার তারিখের ফাতেহার মধ্যে কর্মগত ও বিশ্বাসগত ভ্রান্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। একে বর্জন করাই উচিত। হযরত গাউসুল আযমের সাথে ভক্তি-ভালবাসার দাবিদারদের পক্ষে কুরআন পড়ে অথবা তারিখ নির্দিষ্ট না করে গরীবদেরকে খানা খাইয়ে তাঁর প্রতি সওয়াব রিসানী করাটাই হলো যথার্থ কাজ।—আল-হুবূর, পৃষ্ঠা ৩২

প্রশ্ন ঃ ৮. হযরত আবদুল কাদের জীলানী (র) সম্পর্কে ভিত্তিহীন ঘটনা।

একটা ঘটনা এভাবে প্রচার করা হয় যে, জনৈকা বৃদ্ধা বড় পীরের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট মৃত পুত্র জীবিত করে দেয়ার আবেদন জানায়। তিনি বললেন ঃ ছেলের হায়াতের সমাপ্তি ঘটেছে তাই জীবন দান সম্ভব নয়। কিন্তু বৃদ্ধা বারংবার অনুরোধ জানিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। তখন তিনি আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিবেদন করলেন ঃ উক্ত ছেলেকে জীবিত করে দেয়া হোক। উত্তর আসল, ছেলের ভাগ্যে নির্ধারিত হায়াত শেষ তাই জীবিত হতে পারে না। তিনি তখন আল্লাহ্কে বললেন ঃ একটু অনুগ্রহ করুন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে আল্লাহ্কে উদ্দেশ করে তিনি বল্লেন, হুযূর! তার ভাগ্যে জীবন নাই বলেই তো আপনার প্রতি অনুরোধের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর ভাগ্যে জীবনের কিছু অংশ বাকি থাকলে তার জীবন দানে আপনি

নিজেই বাধ্য ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্ মাফ করুন!) সেখান থেকে জবাব এল—কিন্তু তাকদীরের বিরুদ্ধে কাজ তো হতে পারে না। এতে গাউসুল আযম রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কাশফের শক্তিবলে মালাকুল মউতকে তালাশ করলেন যে তিনি কোথায় আছেন। অতঃপর লক্ষ করে দেখতে পান যে, সে দিনের মুর্দারগণের রূহসমূহ থলিতে পুরে মউতের ফেরেশতা নিয়ে যাচ্ছে। হেড কোয়ার্টারে পৌঁছার পূর্বেই তিনি তাকে বললেন ঃ ছেলের রূহ ফেরত দাও, একে নিতে পারবে না। ফেরেশতা অস্বীকার করতে থাকলেন। তিনি তাঁর হাত থেকে থলি ছিনিয়ে এনে তার মুখ খুলে দিলেন। ফলে সমস্ত রূহ ফর ফর করে উড়ে গেল আর সেদিনের সকল মুর্দা জীবন লাভ করল। গাউসুল আযম এবার আল্লাহ্কে বললেন ঃ কেমন! এখন রাযী হলেন তো ? এক মুর্দাকে জীবন দিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু আমি যখন সকল মুর্দাকে জীবিত করে দিলাম এতে কত আত্মাই না আনন্দিত হবে! তওবা, তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এ ধরনের কথা বলার দুঃসাহস থাকা অসম্ভব। মূলত এসব ঘটনা গণ্ড-মূর্খদের বানানো অলীক কাহিনী মাত্র। শুধু কি তাই ? ঘটনা বিবৃত করার পর তারা আরো বলে—গাউসুল আযম এমন কাজ করতে সক্ষম যা আল্লাহ্র পক্ষেও করা সম্ভব নয়। এহেন কুফরীর কি কোন কূল-কিনারা আছে ? এসব জাহিলরা গাউসুল আযমকে এই পর্যায়ে নিয়ে ঠেকিয়েছে। মহানবী (সা)-এর স্বভাব-চরিত্র এবং মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত না থাকলে এরা তাঁকে যে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছাতো কল্পনারও অতীত। —ফানাউন্ নুফূস ফী-রিষাইল কুদ্দূস, পৃষ্ঠা ৮

প্রশ্ন ঃ ৯. কেউ কেউ হাদীস রচনা করেছে—মহানবী (সা) খোদার আসনে আসীন।

কেউ কেউ মনগড়া হাদীস রচনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খোদা সাব্যস্ত করার প্রয়াস চালিয়েছে। সুতরাং এ জাতীয় একটা বানোয়াট হাদীস হলো— انا عرب بلا عين (আমি আইনবিহীন আরব)। বাক্যটির শব্দরূপই নির্দেশ করে যে, এটি কোন মূর্খের অবসর সময়ের কীর্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইচ্ছা করলে পরিষ্কারই বলতে পারতেন انا رب (আমিই খোদা) ? তা-না করে এহেন ধাঁধার আশ্রয়ে انا عرب بلا عين বলার কি দরকার ছিল, আমাদের বুঝে আসে না। আর এ বাক্য দ্বারা তাদের দাবিই বা কি করে প্রমাণ হয় তাও বোধগম্য নয়। কেননা عرب -এর 'বা' বর্ণটি তাশদীদবিহীন। এ থেকে 'আইন' বর্ণটি বিচ্ছিন্ন করলে বাকি থাকে رب (রাবুন) যার কোন অর্থ হয় না। তাহলে এর দ্বারা তাশ্দীদযোগে رب (রাব্বুন) কিছুতেই প্রমাণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত 'আরব' নন বরং তিনি ছিলেন عربی (আরবী), তাই "আনা আরবুন" (انا عرب) বাক্য প্রয়োগ

অশুদ্ধ বচন। অথচ তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও পণ্ডিত। তাঁর বাক্য ও কথা খুঁত ধরা আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। বোকারা হাদীসের নামে বাক্য গড়ে তাও এমন বাক্য বিন্যাসের আশ্রয়ে নিম্নশ্রেণীর একজন ছাত্রও অঙ্গুলি নির্দেশ করে যা ভুল দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মুহাদ্দিসগণ মত প্রকাশ করেছেন—শব্দগত অশুদ্ধিও জা হাদীসের নিদর্শন। অথচ আলোচ্য বাক্যে শব্দরূপের সাথে সাথে অর্থ এবং মর্ম অস্পষ্ট, অশুদ্ধ। কেননা উক্ত বাক্যের অর্থ رَبْ না হয়ে رَبَ হয়, যা অর্থহীন শব্দ এবং কতিপয় বর্ণের সমষ্টি মাত্র।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে তারা অপর একটি হাদীস বানিয়েছে— احمد بلا میم (আমি মীম ছাড়া আহমাদ)। বস্তুত এটা হাদীস নয়; বরং আহমাদ জাম (র)-এ চেতনাহীন অবস্থার ব্যাখ্যা সাপেক্ষ উক্তি। ব্যাখ্যার সুযোগ না থাকলে এটা বর্জনীয় পরিত্যাগযোগ্য। কেননা কারো অচেতন অবস্থার বাক্য বা উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে আরো একটি হাদীস তারা রটনা ক থাকে যে, তিনি মহানবী (সা)-কে মদীনার কোন গলিতে দেখতে পেয়ে বলেছিলেন:

رائت ربی یطوف فی سکک المدینة -

অর্থাৎ মদীনার গলিপথে আমার খোদাকে আমি ঘোরাফিরা করতে দেখেছি একেই যদি হাদীস বলা হয় তাহলে তো প্রত্যেক সূফীই একেকজন খোদা। যেমন মু এক সূফী বলত—আল্লাহ্ যাকে বলা হয় আমিই সে আল্লাহ্। (নাউযুবিল্লাহ! আল্লা মাফ করুন!) এ নির্বোধরা এ জাতীয় অসংলগ্ন উক্তি দ্বারা অধ্যাত্মবাদকে (তাসাউফ কলংকিত করে ফেলেছে। ফলে ইসলাম আজ অমুসলমানদের হাসির পাত্র। এ ইংরেজ জনৈক মুসলমানকে উদ্দেশ করে বলে—তিন খোদা বলাতে আমাদের ওপ তোমাদের আপত্তি অথচ তোমাদের 'টুপী' তো (সূফী) প্রত্যেক বস্তুকেই খোদা সাব্য করে রেখেছে। সঠিক অর্থ না বোঝার দরুন এ মূর্খরা "ওয়াহ্দাতুল ওয়াজুদের (একক সত্তা) সর্বনাশ ঘটিয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পর্যন্ত তারা মানুষে উর্ধ্বে তুলে খোদার আসনে বসিয়েছে। অথচ বাস্তবের সাক্ষী হলো—মানুষেরই ন্যা তিনি চলাফেরা, খাওয়া-পরা, প্রস্রাব-পায়খানা সবই করেছেন। উহুদের ময়দা দুশমনের আঘাতে আহত হয়েছেন, ইহুদীর যাদু তাঁর ওপরও ক্রিয়া করেছে জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর স্বরূপ প্রকাশের আবেদন করলে জিবরাঈল নিজে আস রূপ জাহির করেন, তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অচেতন হয়ে পড়েন।

—তাহ্সীলুল মারাম, পৃষ্ঠা ৯

প্রশ্ন ঃ ১০. পশু-পাখি ইত্যাদিকে কুলক্ষণ মনে করা কুসংস্কার।

মাওলানা থানভী (র)-কে একবার প্রশ্ন করা হয়—ঘোড়া ইত্যাদিকে অশুভ লক্ষণ মনে করা হয়, এর কোন ভিত্তি আছে কি ? তিনি বললেন, আদৌ না, সব কুসংস্কার। এ সম্পর্কে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি—একবার এক নিগ্রো পথে পাওয়া আয়নায় আপন চেহারা দেখে ভাবল আয়নাই খারাপ। তদ্রূপ আমাদের অবস্থা—নিজের দোষ পরের চরিত্রে লক্ষ করি। বস্তুত বিপদ তো চাপে নিজের গুনাহ্র প্রতিক্রিয়ায়। এখন এটাকে পশুর সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়—অমুক ঘোড়ার লক্ষণ সুবিধার না। অথবা অমুক প্রাণী অমুক সময় আওয়াজ দিয়েছিল তাই কাজটা ভেস্তে গেল। এ সময় একটি হাদীসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "অন্তরে কখনো অশুভ লক্ষণের ভাব সৃষ্টি হলে অমুক দোয়া পাঠ করবে।" এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত এর কোন প্রভাব রয়েছে যা থেকে বাঁচার জন্য দোয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন ঃ এটা কেবল মনের বিচলিত ভাব দূর করত প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, অন্যথায় এর দ্বারা কোন প্রতিক্রিয়ার অনিবার্যতা প্রমাণ হয় না।

অতঃপর নেক ফাল তথা শুভ লক্ষণ গ্রহণের হাদীস-প্রদত্ত অনুমতি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ সেটাও কোন বাস্তব ক্রিয়াশীল নয়। নেক ফালের সারবত্তা এই যে, কোন ভাল জিনিস সামনে আসলে আল্লাহ্র প্রতি ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ্ চাহেন তো আমার কাজ সমাধা হবে। পক্ষান্তরে অন্তরে অশুভ লক্ষণ পোষণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্র প্রতি কু-ধারণা কল্পনা করা। কাজেই এটা নিষিদ্ধ আর সুধারণা অনুমোদিত। —মুজাদালাতে মা'দিলাত, দাওয়াতে আবদিয়ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪

প্রশ্ন ঃ ১১. সূফীদের পরিভাষায় কাফির অর্থ—নশ্বর, বিলীনকারী।

প্রশ্ন উঠেছে কুফরী বাক্য তো দূরের কথা, মিথ্যা ও কুফরীর সম্ভাবনা রয়েছে যাহেরী আলিমগণের নিকট আজো পর্যন্ত এ জাতীয় বাক্য ও মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ সূফীদের কথাবার্তায় 'কাফির' শব্দের ব্যবহার প্রায়শ লক্ষ করা যায় যা দ্বারা খোদার প্রতি বাস্তব অস্বীকৃতি প্রমাণিত ও অনিবার্য হয়ে পড়ে। জবাবে বলা হয়—জি-না, অর্থ এটা নয়। সূফীদের পরিভাষায় কাফির অর্থ—বিলীনকারী, নশ্বর। কবি খসরুর ভাষায় ঃ

کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست

هر رگ من تار گشته حاجت زنار نیست

—প্রেমানলে আপন সত্তা ও আত্মা আমি বিলিয়ে দিয়েছি, তাই আমার আনুগত্যের প্রয়োজন নেই, আমার দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা সূত্রবৎ, কাজেই পৈতা আমার কোন্ কাজের।

اے فانی عشقم অর্থাৎ আমার প্রেমে লীন ওহে! এ অদৃশ্য আওয়াজের মর্ম দাঁড়ায়—যথেচ্ছ আমল কর, তোমার মৃত্যু হবে নিবেদিতপ্রাণ এবং বিলিয়ে দেয়া সত্তা হিসেবে। কথাটা সে হাদীসেরই সমার্থবোধক যাতে বলা হয়েছে—

اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

—মহান আল্লাহ্ বদরী সাহাবীগণের প্রতি লক্ষ করে বলেছেন ঃ তোমরা যথেচ্ছ আমল কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

সূফীগণ এ অর্থ অভিধান থেকে গ্রহণ করেছেন। কেননা অভিধানে 'কুফর' অর্থ লুকানো, আচ্ছাদিত করা। আর ফানী (فانى) অর্থ আপন সত্তা গোপনকারী। বলা বাহুল্য, সূফীদের পরিভাষা কোথাও অভিধান থেকে, কোথাও প্রচলিত অর্থ থেকে, কোথাও কালাম ও দর্শনশাস্ত্র হতে আবার কখনো অন্য বিষয় থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের এ মিশ্রণের উদ্দেশ্য হলো আসল ভেদ গোপন রাখা।

কবি বলেছেন ঃ

بامدعى مگوئيد اسرار عشق ومستى

بگذار تابميرد در رنج خود پرستى

—প্রতিপক্ষের নিকট প্রেমের রহস্য উন্মোচন করবে না, ছেড়ে দাও মরে যাক সে আত্মগর্বে।

এ জন্যই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভেদ-রহস্য নিষ্প্রয়োজনে প্রকাশ্যে প্রচার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আমি এখন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই বর্ণনা করছি। মোটকথা, এ গায়েবী আওয়াজ ছিল সূফীদের পরিভাষার ব্যাখ্যা, সাধারণ পরিভাষার নয়। আশেক তথা প্রেমিকের সাথে কিছু সময় রসিকতার ছলে এ শিরোনাম গ্রহণ করা হয়েছে। আর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী (সা) কোন কোন সময় নির্দোষ কৌতুক করেছেন। সুতরাং জনৈকা বৃদ্ধার জান্নাত লাভের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি বললেন ঃ لا تدخل العجوز الجنة অর্থাৎ বৃদ্ধা নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বৃদ্ধা কান্না জুড়ে দিলে انا انشأنا هن انشاء فجعلنا هن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين [আমি তাদেরকে -(নারীদেরকে) নতুন করে সৃষ্টি করব আর তাদেরকে আমি জান্নাতীদের সমবয়সী এবং অনিন্দ্য সুন্দরীরূপে সৃষ্টি করব। অধিকন্তু তারা হবে কুমারী] আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সান্ত্বনা দান করেন। যার মর্ম হলো—বৃদ্ধা নারী বৃদ্ধাবস্থায় নয় বরং যুবতী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ যর গিফারী (রা) একবার একই কথা বারবার জিজ্ঞেস করাতে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক বার জবাব দেন এবং শেষ বার বলেন ঃ وان رغم انف ابى ذر অর্থাৎ আবূ যরের নাক ধুলায় লুটালেও জবাব এটাই। এটাও ভর্ৎসনার সুরে কৌতুকই ছিল। কিন্তু প্রেমিক এতেই স্বাদ পায়। তাই দেখা যায় হযরত আবূ যর (রা) যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন শেষে বলতেন وان رغم انف ابى ذر وان رغم انف ابى ذر (আবূ যরের নাক ধুলায় লুটালেও আবূ যরের নাক ধুলায় লুটালেও)। কেননা এতে তিনি আনন্দই লাভ করতেন। শায়খ আবুল মাআলী (র)-এর জনৈক মুরীদ হজ্জে রওয়ানা হলে তার মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা পাকে সালাম পাঠান। মদীনা পৌঁছে উক্ত মুরীদ যথারীতি সালাম আরয করলে রওযা পাক থেকে উত্তর আসে "তোমার বিদ'আতী পীরকে আমার সালামও পৌঁছিয়ে দিও।" কাশফযোগে শায়খ ব্যাপারটা জানতে পারেন। মুরীদ ফিরে আসলে সালাম পৌঁছিয়েছে কি-না তিনি জানতে চাইলে মুরীদ বলল ঃ জী-হ্যাঁ, পৌঁছিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও আপনাকে সালাম বলেছেন। শায়খ বললেন ঃ হুবহু রাসূলুল্লাহ্র ভাষায় বল। মুরীদ বলল ঃ আপনার নিজেরই যেহেতু জানা আছে তাই আমাকে কেন বে-আদব বানাচ্ছেন। তিনি বললেন, এতে বে-আদবীর কি কথা, এখন তো এটা তোমার মুখের কথা নয়, বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্র মুখের ভাষা। তুমি কেবল তাঁরই ভাষ্যকার। যাই হোক অবশেষে মুরীদ ব্যক্ত করল যে, "তোমার বিদ'আতী পীরকেও আমার সালাম পৌছাবে।" একথা শোনা মাত্রই শায়খ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন এবং ছন্দ আবৃত্তি করেনঃ

بدم گفتى وخور سندم عفاك الله نكو گفتى

جواب تلخ مى زيبد لب لعل شكر خارا

—তোমার মন্দ বচনেও আমি পুলকিত, সুন্দর কথাই বলেছ, আল্লাহ তোমায় উত্তম প্রতিদান দিন, কটুবাক্য ও তিক্ত জবাব সুন্দর মুখেই শোভা পায়।

হযরত আবূ যর (রা)-এর বারবার وان رغم انف ابى ذر উচ্চারণে এ রহস্যই নিহিত রয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

اگر ایکبار بگوید بنده من - از عرش بگزرد خنده من

—মাত্র একটি বার সে আমাকে "আমার গোলাম" সম্বোধন করলে আমার

আনন্দের লহরী আরশের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। আর এটাই হবে আমার সর্বাধিক প্রিয় নাম।

এমনকি হাদীসেও স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক কৌতুকের প্রমাণ রয়েছে। বর্ণিত আছে—জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মুসলমানদের উপাধি হবে 'জাহান্নামী'। আর এতেই তারা আনন্দ উপভোগ করবে। বলা হয়েছে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে আল্লাহ বলবেন ঃ বল, কি চাও। সে আরয করবে—জাহান্নামের দিক থেকে আমার চেহারা ঘুরিয়ে দেয়া হোক। আল্লাহ বলবেন, এরপর আর কিছু চাইবে না তো ? সে বলবে—না। সুতরাং তাই করা হবে। তখন জান্নাতের একটি বৃক্ষ দেখতে পেয়ে সে আরয করবে—হে আল্লাহ্! আমাকে উক্ত বৃক্ষের নিচে পৌঁছিয়ে দিন। বলা হবে—তুমি না আর কিছু চাইবে না বলে ওয়াদা করেছিলে ? সে নিবেদন করবে—আমার এ আবেদনটুকু কেবল পূরণ করা হোক এর অধিক আর কিছুই চাইব না। যাহোক এমনিভাবে ক্রমান্নয়ে সে জান্নাতেই পৌঁছে যাবে। মোটকথা—জান্নাতে তাকে পৌঁছানো হবে, তবে কৌতুক রসে একটু ঘষা-মাজার ছত্রছায়ায়। সুতরাং সে ঘটনায় আপত্তির আর কোন অবকাশ থাকতে পারে না। যেহেতু তাতেও কৌতুকের প্রমাণ রয়েছে। দ্বিতীয়ত গায়েবী আওয়াজে উল্লিখিত 'কাফের' অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা নয়, বরং 'তাগূত'কে অস্বীকার করা। কুরআন শরীফেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى -

—আর যে ব্যক্তি খোদাদ্রোহী তাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্কে বিশ্বাস করবে সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় রজ্জু। —আল-মুরাবিত, পৃষ্ঠা ২৬

প্রশ্ন ঃ ১২. বিদায়ী খুৎবা উপকারবিহীন, নিছক বিদ'আত।

বিদায়ী খুৎবার উপকারিতা ব্যাখ্যা করা মূলত আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের নামান্তর। বিভিন্নমুখী উপকারিতার প্রেক্ষিতে কোন বিদ'আত কাম্য হওয়ার দরুন সে ব্যক্তির ধারণায় যেন কুরআন-হাদীসের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল যে, কোন কোন জরুরী শিক্ষা বাদ পড়েছিল তাই এর দ্বারা সেটুকু পূরণ করা হলো। বলা বাহুল্য, এর সমর্থক কেউ হতে পারে না। এরই জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বিদ'আত মাত্রকেই ضلالت তথা গোমরাহী আখ্যা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন বিদ'আত পছন্দনীয় হওয়া দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হলে বলতে হয় মূলত সেটা বিদ'আতই নয়। এ জাতীয় সন্দেহ বিদায়ী খুৎবায় হতে পারে না। কারণ এটা সুন্নতের পরিপূরক অথবা

অর্থবোধক হলে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জীবনাচরণে এর নযীর অবশ্যই বিদ্যমান থাকার কথা। যা ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাঁদের জীবনাদর্শের সাথে দূরবর্তী কোন ক্ষীণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব যদি হয়ও তাহলে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার সমাধান কি হবে যে, জনসাধারণ একে অনিবার্য মনে করার ফলে প্রথমত তা বিদ'আত এবং পরে গোমরাহীতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাহান্নামের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্র বাণী মূলত আল্লাহরই কালাম। সুতরাং এ ধরনের কার্যকলাপ অনিবার্য মনে করা এবং এর উপকারিতা ব্যক্ত করা একদিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের ওপর অভিযোগ সৃষ্টি, দ্বিতীয়ত আল্লাহ ও রাসূলের শানে বিদ্রূপের নামান্তর। কিন্তু "রাসূলের বাণী আল্লাহ্রই কালাম" আমার এ উক্তি দ্বারা কারো এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া সমীচীন নয় যে, মহানবী (সা) ইজতিহাদ করতেন না। বস্তুত ইজতিহাদ তিনি অবশ্যই করতেন, কিন্তু তার বাস্তবায়ন ছিল ওহী-নির্ভর। এর বিপক্ষে ওহীর ভাষ্য না থাকলে সেটা দলীলরূপে গণ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে নীরবতা সমর্থনের নিদর্শন। অথবা ওহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইজতিহাদকে সংশোধন করে দেয়া হতো। মোটকথা, যে কোন অবস্থায় সেটাও ওহীর মর্যাদা লাভ করত। সুতরাং তাঁর ইজতিহাদ সত্ত্বেও এটা বলা যথার্থ যে,

گفته او گفته الله بود - گرچه از حلقوم عبد الله بود

—তাঁর কথা মূলত আল্লাহ্রই ভাষ্য, যদিও তা রাসূলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। —ইকমালুল আওয়াম ওয়াল ঈদ, পৃষ্ঠা ৬

প্রশ্ন ঃ ১৩. কবরবাসীর নিকট সাহায্য কামনা করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) মাওলানা থানভী (র) বলেন ঃ কুরআনের اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ (আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করবেন না) আয়াতে উল্লিখিত শিরকের পরিচয় হলো—কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। আর কারো সামনে দীনহীন, কাতর ও মিনতিপূর্ণ আত্মনিবেদনের নাম ইবাদত। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা, কাজেই তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে এভাবে আত্মনিবেদন করা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যাক। যেমন কোনও দু-জন লোকের একজন মর্যাদাবান। এখন তিনি ভিক্ষুকের হাতে কিছু দান করলেন। আর ফকীর দাতার স্থলে দ্বিতীয়জনের গুণ-কীর্তন ও স্তুতিবাক্য আরম্ভ করে দিলে দাতার মনে অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তদ্রূপ শিরকের কারণে মহান আল্লাহ্র আত্মমর্যাদায়ও আঘাত পড়ে। কবর-মাযারে

ওলী-আল্লাহ্দের নিকট প্রার্থনাকারীদের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করা দরকার যে, তার কি কেবল উপায়-অসীলা হিসাবে আবেদন জানায় নাকি এর সাথে অতিরিক্ত আরো কিছু যুক্ত থাকে। আরবের পৌত্তলিকরা নৈকট্যলাভের উপায় হিসেবেই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সুতরাং কুরআনের ভাষায় ঃ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى (একমাত্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই আমরা এদের পূজা করে থাকি।) তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত কর হয়েছে যে, খোদার নৈকট্য লাভের আশায়ই তারা শিরকে লিপ্ত ছিল, তা সত্ত্বে তাদেরকে মুশরিক আখ্যা দেয়া হয়েছে কোন্ কারণে ? ব্যাপারটা পর্যালোচনা সাপেক্ষ। প্রণিধানযোগ্য যে, অসীলা দুই প্রকার। দৃষ্টান্তের আলোকে ব্যবধানটা স্পষ্ট হবে। যেমন মনে করুন, জনৈক কালেক্টর তার কাজকারবার, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়-আশয় দেখাশুনার ভার একজন দক্ষ কেরাণীর হাতে অর্পণ করে দিল তদ্রূপ অপর একজন কালেক্টর, তারও কেরাণী আছে। কিন্তু তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ, কেরাণীর দায়িত্বে না দিয়ে কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য নিজে দেখাশুনা করেন। এখন প্রথমোক্ত দক্ষ কেরাণীর নিকট কোন বিষয়ে কেউ দরখাস্ত পেশ করতে চাইলে তাকে কর্মকর্তা মনে করেই করবে, তাকে তোষামোদও করবে, যদিও চূড়ান্ত সই কালেক্টরই দেবে। কিন্তু কেরাণীর অমতে নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত পেশ করতে হলেও কেরাণীর মাধ্যমেই আসতে হবে কেননা সে মনিবের প্রিয়জন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে মনিবের কাছে কেউ যেতে সাহস পায় না। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়—উভয়ক্ষেত্রে মাধ্যম যদিও কেরাণী কিন্তু নিয়তে ব্যবধান সুস্পষ্ট।

বলা বাহুল্য, জনগণের ভক্তি-ব্যবহারে কবরবাসীদের সাথে প্রথম কেরাণীর ন্যায় আচার-আচরণই প্রকাশ পায়। এটা শিরক নয়তো কি ? অবশ্য নামমাত্র অসীলা ধারণা করা অন্য কথা। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে গায়রুল্লাহ্র ইবাদতই শিরক, চা অসীলার আকারেই হোক না কেন। মোটকথা, শরীয়তসম্মত উপায়ে অসীলা গ্রহ জায়েয, কিন্তু অসীলার মাধ্যমে ইবাদত করা শিরক।

—মাকালাতে হিকমত, নং ৫৭, দাওয়াতে আবদিয়ত, ১ম খ

(খ) মানুষ পার্থিব সাহায্য-সহায়তা পাওয়ার আশায় মাযারে ধরনা দেয়। কি অলী-আল্লাহ্দের শানে এটাও এক ধরনের বে-আদবী। কেননা তাঁরা মহান আল্লাহ্ নৈকট্যশীল, জীবিতকালেই যে ক্ষেত্রে পার্থিব ঝামেলা তাঁদের পছন্দ ছিল না—এখ মরণোত্তর জীবনে নির্ভেজাল পরকাল বিষয়ে ডুবে থাকা অবস্থায় একই বস্তু তাঁদে মনঃপূত কি করে হতে পারে ? এমতাবস্থায় পার্থিব বিষয়াদি তাঁদের সাহায্য কাম

শরীয়ত ও বিবেক-বুদ্ধি উভয়ের পরিপন্থী। কেননা পার্থিব বিষয়াদি বর্তমানে তাঁদের ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত। কাজেই কারো নিকট 'নেই' বস্তুর কামনা অযৌক্তিক, অর্থহীন। তবে হ্যাঁ, প্রার্থনা এমন বিষয়ে করা যেতে পারে, যা তাদের অধিকারে আছে। সুতরাং সাহেবে নিসবত তথা আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি এখনো তাঁদের কাছ থেকে ফয়েয ও বরকত লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের গোটা মাযার খনন করলেও টাকা-পয়সা কিংবা ধন-দৌলতের কোন হদিস মিলবে না। কাজেই এমন জিনিস প্রার্থনা করা বিবেক বর্জিত কাজ। অবশ্য তাঁদের দোয়ার আশায় যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ নিয়তে যায় কোন্ ভাগ্যবান ? সাধারণ বিশ্বাস তো এই যে, পীরসাহেব নিজে দান করেন। সুতরাং কানপুরের জনৈকা বৃদ্ধা এক ব্যক্তির কাছে এসে ধরল, বড় পীরের নামে 'নিয়ায' করে দাও। সে বলল, বুড়ি মা! নিয়ায তো আল্লাহ্র নামে আর তার সওয়াব দেই পীর সাহেবের নামে। বৃদ্ধা বলল, না, আল্লাহ্র নিয়ায তো আমিই দিয়েছি, এতে কেবল বড় পীরের নিয়ায করে দাও। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, জনসাধারণের ধারণায় পীর-বুযুর্গগণ মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী। একবার জামে মসজিদে জনৈকা বৃদ্ধা এসে বলল, তাযিয়ার ওপর ঝুলানোর উদ্দেশ্যে এক টুকরা কাগজ লিখে দাও। আমি বললাম, এখানে এরূপ কেউ লিখতে জানে না। আরেকবারের ঘটনা—এক লোক ঘটনার বিবরণ দিল যে, তাযিয়ার মধ্যে আমি মোমের পুতুল দেখেছি। প্রকৃত ঘটনা হলো, এক ব্যক্তি তাযিয়ার মধ্যে সন্তান লাভের আবেদনপত্র ঝুলিয়ে দিলে অপর একজন এর নিচে লিখে দেয় যে, "তোমার স্ত্রী বন্ধ্যা, একে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে কর।" তার নিচে ছন্দ লিখল ঃ

زمین شور سنبل بر نیاید

در و تخم عمل ضائع مگر دان

(অর্থাৎ লবণাক্ত যমীনে ফসল ফলে না, কাজেই এর পিছনে নিষ্ফল পরিশ্রম করো না) শেষে লিখেছে—লেখক ইমাম হুসাইন।

দরখাস্তকারী লেখা পড়ে তো গোস্সায় আগুন! "আমার সাথে বিদ্রূপ করল কে?" একজন বলল ঃ আপনি কি করে বুঝলেন এটা যে অন্যের লেখা। দরখাস্ত যেহেতু ইমাম হুসাইন বরাবরে, কাজেই সম্ভবত তিনি নিজেই লিখেছেন। কারণ যে পড়তে জানে সে লিখতেও তো পারে ?

মোটকথা—এই হলো মানুষের বর্তমান অবস্থা, যা শরীয়ত ও শালীনতার পরিপন্থী এবং বে-আদবী। সত্য বলতে কি দুনিয়া সে সকল বুযুর্গদের এতই অপ্রিয় ভদ্র মজলিসে যেমন মল-মূত্রের আলোচনা। হযরত রাবেয়া বসরীর সাহচর্যে বসে

কয়েকজন বুযুর্গ দুনিয়ার নিন্দা চর্চায় লিপ্ত হন। তিনি বললেন, চলে যাও দরবার ছেড়ে, মনে হয় দুনিয়া তোমাদের প্রিয় বস্তু। কেননা من احب شيئا اكثر ذكره যে যাকে ভালবাসে তার চর্চাই সে বেশি করে। —ইত্তেবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ৯

প্রশ্ন ঃ ১৪. জন্মদিনকে উৎসবে পরিণত করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবমাননা।

নিজেদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বিজাতীয়দের আচরণের অনুসরণে এ উপমহাদেশস্থ আধুনিকতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একশ্রেণীর প্রগতিমনা লোককে মহানবী (সা)-এর জন্মদিবসকে আনুষ্ঠানিক উৎসব দিবসে পরিণত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেশ তৎপর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত যে, মিলাদুন্নবীর আনন্দ পার্থিব পার্বণ নয়, এটা একটা ধর্মীয় উৎসব। কাজেই এর নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়নে সবার আগে ওহীর অনুমতি প্রয়োজন। কেউ যদি বলে যে, আমরা বার্ষিকী হিসাবে প্রচলিত নিয়মাকারে এ উৎসব পালনে আগ্রহী, তবে আমি বলব—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শানে এটা চরম বে-আদবী। বন্ধুগণ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ ও কর্মের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই এমনসব রাজা-বাদশাহদেরকে তাঁর সাথে তুলনা করা সঙ্গত হবে কি যে, এই নিয়মে, অভিন্ন রূপকাঠামোতে আমরাও তাদের জন্মোৎসবের ন্যায় মিলাদুন্নবী উৎসবে মেতে উঠি ?

چه نسبت خاك را باعالم پاك

সে পবিত্র জগতের সাথে এ মর্ত্যলোকের কি সম্পর্ক ? এ পর্যায়ে 'অরণ্যবাসী জনৈক বুযুর্গের ঘটনা আমার মনে পড়ল। তিনি একটি কুকুরী পালন করতেন। ঘটনাক্রমে কুকুরীর বাচ্চা হলে তিনি শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সেখানকার বুযুর্গ ব্যক্তিকে এ থেকে বাদ রাখলেন। তাই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বলে শহরের বুযুর্গ দাওয়াত থেকে বাদ পড়ার অনুযোগ পাঠান। অরণ্যবাসী বুযুর্গ জবাবে বলে পাঠান যে, হযরত! আমার এখানে বাচ্চা হয়েছিল কুকুরীর, তাই দুনিয়ার কুকুরদের দাওয়াত করেছি। এসব দুনিয়ার কুকুরদের সাথে আপনাকে দাওয়াত করাটা আমি চরম বে-আদবী মনে করেছি। দোয়া করুন আমার সন্তান হলে সে আনন্দে অবশ্যই আপনাকে দাওয়াত দেব আর এসব কুত্তার একটিকেও জিজ্ঞেস করব না। তাই ওলী-আল্লাহদের সাথেই যেক্ষেত্রে দুনিয়াদারের ন্যায় আচরণ বে-আদবীতুল্য সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দুনিয়াদারের ন্যায় আচরণ বে-আদবী কেন হবে না ? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মদিনের আনন্দ যে পার্থিব নয়—ধর্মীয় উৎসব এর স্বপক্ষে প্রমাণ নিন। এটা সবার জানা কথা যে, ইহজগত বলতে এ মাটির পৃথিবী এবং এর সংলগ্ন কয়েক মাইল শূন্যলোক বোঝানো হয়। তাই কোন জাগতিক

আনন্দের প্রভাব এ পৃথিবীর পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অথচ মহানবী (সা)-এর জন্মলগ্নে দুনিয়ার সৃষ্টিকুলই নয়; বরং ফেরেশতাকুল, আরশ, কুরসী তথা সমগ্র সৃষ্টিজগত আনন্দে আত্মহারা ছিল। কেননা মহানবী (সা)-এর জন্ম ছিল কুফরী ও গোমরাহীর তমসা ছিন্নকারী আর একত্ববাদ, সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পতাকাবাহী। যাঁর অসীলায় বিশ্ব জাহান স্থিতিবান। আর কিয়ামতের আগমনে অধিকাংশ ফেরেশতাও বিলীন হয়ে যাবে। অতএব তাঁর আবির্ভাব সৃষ্টি জগতের স্থায়িত্বের অসীলা। তাই এ আনন্দ সমগ্র সৃষ্টিকুলের মহোৎসব। এর প্রভাব ইহজগতের গণ্ডি ছেদন করার কারণে এটাকে নিছক জাগতিক আনন্দ বলা যায় না। যখন প্রমাণিত হলো যে, এটা ধর্মীয় উৎসব কাজেই এর উদযাপন পদ্ধতি প্রণয়ন এবং নীতিমালা নিরূপণে ওহীর নির্দেশ অনিবার্য। এখন মিলাদ অনুষ্ঠানের প্রস্তাবকরা আমাদের সামনে পেশ করুক কোন্ ওহীর ভিত্তিতে মিলাদুন্নাবীর অনুষ্ঠানসূচী এবং রূপকাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। কেউ যদি قل بفضل الله (বল—আল্লাহ্র অনুগ্রহে) আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করতে ইচ্ছা করে, তবে আমি বলব—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যলাভকারী আর জগতের সর্বাধিক কুরআনিক তথ্য ও তত্ত্ববিদ সাহাবীগণের বিবেকে এ মাসআলাটা কেন স্থান পেল না ? অথচ তাঁদের রক্ত-মাংসে, দেহের অণু-পরমাণুতে রাসূলের ভালবাসা মিশ্রিত ছিল। তদ্রূপ জগত বিখ্যাত মুজতাহিদ তাবেঈগণের দূরদৃষ্টিই বা এ পর্যন্ত পৌঁছল না কেন ? অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমোদিত বিষয় অবশ্যই পালন করা উচিত। যেমন তিনি স্বীয় জন্মদিনে রোযা রেখেছেন আর বলেছেন ঃ ذالك اليوم الذى ولدت فيه (এটা আমার জন্মদিন)। কাজেই এ দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব হতে পারে। দ্বিতীয়ত এ দিনে বান্দার আমলনামা আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। সুতরাং এ উভয় কারণে অথবা যে-কোন একক কারণের ভিত্তিতে রোযা পালন করাও বিশুদ্ধ। কিন্তু এ আমল ততটুকুর মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে, যে পরিমাণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

—আকমালুস্‌সওম ওয়াল ঈদ, পৃষ্ঠা ৩৪

প্রশ্ন ঃ ১৫. উরসের সঠিক মর্ম, প্রচলিত উরস শরীয়তসম্মত নয়।

মানুষ বর্তমানে বুযুর্গদের নামে উরসের যে পন্থা অবলম্বন করেছে এটা শরীয়তসিদ্ধ নয় এবং সীমালংঘনের শামিল। মূলত উরসের আভিধানিক অর্থ—আনন্দ ও খুশি, প্রেমিক-প্রেমাস্পদের মিলনে যা অর্জিত হয়ে থাকে। ওফাতের মাধ্যমে যেহেতু প্রেমাস্পদের সাথে তাদের মিলন সাধিত হয়, কাজেই তাদের মৃত্যুদিবসকে 'ইয়াওমুল উরস' বলা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে—কোন সত্যপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর

পর কবর জগতের প্রশ্নোত্তর শেষে ফেরেশতা তাদেরকে বলেন ঃ نم كنومة العروس (নব্য বিবাহিতের ন্যায় ঘুমাও)। তাই এ দিনটি তাদের জন্য উরসের দিন তুল্য। এ মর্মে জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

خوشا روزے وخرم روز گارے
که بارے بر خورد از وصل یارے

—(সে দিনটি বড়ই আনন্দের, একবার যেদিন বন্ধুর সাথে মিলন-সুধা উপভোগের সুযোগ মিলে)। পরজগতের ন্যায় পার্থিব জীবনে যদিও তাঁদের মিলন ঘটে, কিন্তু দুই মিলনে বিরাট ব্যবধান। কারণ জাগতিক মিলন পর্দাসহ আর মরণোত্তর মিলন আবরণমুক্ত। মাওলানা রূমী বলেন ঃ

گفت مکشوف وبرهنه گو که من
مے نه گنجم باصنم در پیر هسن

—প্রেমিক প্রেমাস্পদকে সম্বোধন করে বলতে লাগল—আবরণমুক্ত হও, কেননা প্রেমাস্পদের সাথে বস্ত্রের আচ্ছাদনে আমার ঠাঁই হয় না।

মহান আল্লাহ, দেহ ও আনুষঙ্গিক বস্তু থেকে পবিত্র কিন্তু এটা কেবল দৃষ্টান্তমূলক ভাষ্য। হযরত গাউসুল আযম বলেছেন ঃ

بے حجابا نه در آ از در کاشانه ما
که کسے نیست بجز درد تو در خانه ما

—আবরণমুক্ত অবস্থায় আমার আস্তানায় পদার্পণ কর, কেননা তোমার বিরহ জ্বালা ব্যতীত আমার অন্তরে আর কিছুই নাই।

এ তো হলো মরণোত্তর মিলনের অবস্থা। কিন্তু পার্থিব জীবনে পর্দার আড়াল হেতু তাঁদের অতৃপ্ত মনের অবস্থা হলো ঃ

دل آرام در بر دل آرام جو
لب از تشنگی خشك وبر طرف جو
نگویم که بر آب قادر نیند
که بر ساحل نیل مستسقی اند

—তোমার প্রিয়জন তোমারই কোলে অবস্থিত অথচ তুমি প্রিয়জনের অন্বেষণে ব্যস্ত। পিপাসায় তোমার ওষ্ঠ শুকিয়ে গেছে অথচ তুমি স্রোতের কিনারে অবস্থিত রয়েছ। আমি এ কথা বলি না যে, তুমি পানি পানে সক্ষম নও, কেননা পিপাসা-কাতর রোগী উপবিষ্ট রয়েছে নীল নদের কিনারায়।

মরণোত্তর জীবনেই যেহেতু তাঁদের এ সম্পদ অর্জিত হয় তাই মরণ কামনায় ব্যাকুল প্রাণে-উৎকণ্ঠচিত্তে তাঁরা বলে ওঠেন ঃ

خرم آنروز کزین منزل ویراں بروم
راحت جان طلبم وز پئے جانان بروم

—সেদিন আমি চির সন্তুষ্ট হব যেদিন এই উজাড় বাড়ি হতে প্রস্থান করব, জীবনে শান্তি অন্বেষণ করব এবং প্রেমাস্পদ ও প্রিয়জনের পিছনে পিছনে গমন করব।

মরণ যেহেতু ওলী-আল্লাহগণের আনন্দের উপাদান তাই এতে তাঁরা সদা প্রফুল্ল। সুতরাং জনৈক নক্শবন্দী বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে—মৃত্যুর পূর্বে তিনি ওসীয়ত করেছিলেন যে, নিম্নোক্ত ছন্দ পাঠরত অবস্থায় আমার লাশ তোমরা বহন করবে ঃ

مفلسا نیم آمده در کوئے تو
شیا لله از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما
آفرین بر دست وبر بازوئے تو

—শূন্য হাতে তোমার আস্তানায় উপস্থিত হয়েছি কেবল তোমার রূপ দর্শনের আশায়। আমার ঝুলির প্রতি হাত বাড়াও, ধন্য হোক তোমার প্রসারিত হাত আর অমলবাহু।

এটা ছিল তাঁদের চরম প্রশান্তির লক্ষণ। কেননা ব্যাকুল প্রাণে কেউ এ জাতীয় ফরমাইশ দিতে পারে না। সুলতান নিযামুদ্দীন আউলিয়ার ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। মৃত্যুর পর তাঁর লাশ বহনকালে জনৈক মুরীদ শোকের আতিশয্যে ছন্দ আবৃত্তি করে ঃ

سرو سیمینا بصحرا می روی
سخت بے مهری که بے ما میروی
ائے تماشا گاه شالم روئے تو
تو کجا بهر تماشا می روی

—হে সুন্দর ! আজিকে এ বিরাণ-বিজন মাঠে কোথায় তোমার গমন, একি কঠোর আচরণ যে, আমাদের ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ। হে সুন্দর! যার চেহারা সৃষ্টিকুলের দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু! তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে তুমিই আবার যাচ্ছ কোথায় ?

বর্ণিত আছে, কাফনের ভিতরই তাঁর হাত উঁচু হয়ে যায়। বন্ধুগণ! এমন ব্যক্তি যার অবস্থা হলো ঃ

پا بدستی دگرے دست بدست دگرے

—"যার হাত-পা পরের কাঁধে সমর্পিত" তার তো ওয়াজ্‌দ হতে পারে না। এতে বোঝা গেল বাস্তবেই সে দিনটি বড় আনন্দের।

অপর একজন বুযুর্গ মৃত্যুকালে প্রেমাসক্ত অবস্থায় বলেন ঃ

وقت آمد که من عریان شوم
جسم بگذارم سراسر جان شوم

—আমার আবরণমুক্ত হওয়ার সময় সমাগত, এখন দেহ ত্যাগ করে আমি পরিপূর্ণ আত্মায় রূপান্তরিত হব।

যেহেতু তিনি অনুভব করছেন যে, এখনই আমার ইহজাগতিক পর্দা উন্মোচিত হয়ে প্রেমাস্পদের দর্শনে আমি ধন্য হব, কাজেই তাঁর এ অবস্থা হবে না কেন ? হযরত ইবনুল ফারেযের ঘটনা উল্লিখিত আছে যে, মৃত্যুকালে তাঁর সামনে জান্নাত উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি ছন্দ ঃ

ان کان منزلتی فی الحب عندکم
ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی

"উপস্থিত যা লক্ষ করছি এই যদি হয় আমার ভালবাসার প্রতিদান তাহলে তো আমার সময় নষ্ট করেছি কেবল" উচ্চারণ করে বললেন যে, প্রাণই তো আপনাকে বিলিয়ে দিচ্ছি, জান্নাতে আমার কি প্রয়োজন। অতঃপর জান্নাত অদৃশ্য হয়ে আল্লাহ্‌র নূরের দীপ্তি প্রকাশিত হয় এবং তিনি পরপারে যাত্রা করেন। তাঁর অবস্থা হুবহু এই হয়েছিল যেমন ঃ

گر بیاید ملك الموت که جانم ببرد
تانه بینم رخ تو روح رمیدن ندهم

—আমার প্রাণ নেয়ার উদ্দেশ্যে যদি মালাকুল মউত উপস্থিত হয়, আপনার দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত নিতে দেব না।

এ অবস্থা শুনে অধিকাংশ লোক হয়তো হতবাক হয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের এ বিস্ময় কেবল এজন্য যে, নিজেরা এ থেকে বঞ্চিত। তাদের সম্পর্কে ঃ

تو مشو منکر که حق بس قادر است

—"তুমি অস্বীকার করো না আল্লাহ তো সবই করতে সক্ষম।" ছন্দ আবৃত্তিই যথেষ্ট। মোটকথা, বুযুর্গদের অবস্থা এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁদের মৃত্যু দিবস উরসের দিন। কিন্তু লোকেরা এর অর্থ ও পাত্র উভয়টাই বিকৃত করে দিয়েছে। প্রয়োগের বিকৃতি তো বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানে যাবতীয় শিরক-বিদ'আত উরসের অঙ্গীভূত। অর্থের বিকৃতি এভাবে হয়েছে যে, উক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করত বিয়ে-শাদীর উপায়-উপকরণ পর্যন্ত সেখানে জমা করা হয়। সুতরাং অধিকাংশ স্থানে প্রথা অনুযায়ী বুযুর্গদের কবরে মেহেন্দী লাগানো হয়, ঢোল-বাজনা ইত্যাদিও সেখানে ব্যবহৃত হয়। বেচারা মুর্দার তো নাগালের বাইরে যত অপকর্ম সব কবর গাত্রে সম্পন্ন হয়।

মূলত বুযুর্গদের আনন্দের দিন বিধায় এটা উরস হিসেবে বিবেচিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উরস যেহেতু নিছক ইহলৌকিক আনন্দের বিষয় নয়, কাজেই এর নিয়ম-পন্থা নির্ধারণে ওহীভিত্তিক নির্দেশ থাকা অনিবার্য। অথচ এর প্রচলিত পদ্ধতির সমর্থনে ওহী তো নাইই বরং ওহীর ভাষ্য এর প্রতিকূলে। সুতরাং এ সম্পর্কিত মহানবী (সা)-এর বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ لا تتخذوا قبری عیدا

—আমার কবরকে তোমরা উৎসবকেন্দ্রে পরিণত করো না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—ঈদ তথা উৎসবের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য। (১) জনসমাবেশ, (২) সময় নির্ধারণ এবং (৩) আনন্দ। অতএব হাদীসোক্ত নিষেধের সার-সংক্ষেপ এই যে, নির্দিষ্ট দিনে আনন্দের উপকরণসহ আমার কবরে তোমরা জনসমাবেশ ঘটাবে না। অবশ্য ঘটনাক্রমে অন্য কোন উপলক্ষে লোক সমাগমের ফলে অনাহূত গণসমাবেশের আকার ধারণ করলে সেটা ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা)-এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়াটা তাঁর পক্ষে আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু আমাদের জন্য তো শোকের কারণ। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে "নশরুত্‌তিব" গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর ওফাতকে আমাদের উপর নিয়ামত ও অনুগ্রহের পরিপূর্ণতা বলে আমি উল্লেখ করেছি সেটা ছিল ভিন্ন প্রসংগে, অন্য হিসেবে। মোটকথা—স্বয়ং মহানবী (সা)-এর রওযা পাকের অঙ্গনে এ জাতীয় সমাবেশ অবৈধ, সে ক্ষেত্রে অন্যদের কবর পাশে সেটা কিরূপে জায়েয ও বৈধ হতে পারে ? বস্তুত এটা এক বিস্ময়কর বরকত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা মুবারকে আজো পর্যন্ত দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করত কোন সমাবেশ ঘটেনি। —ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬

প্রশ্ন ঃ ১৬. আনন্দ ও শোক প্রকাশের প্রচলিত প্রথা শরীয়ত বিরুদ্ধ এবং অবশ্য বর্জনীয়